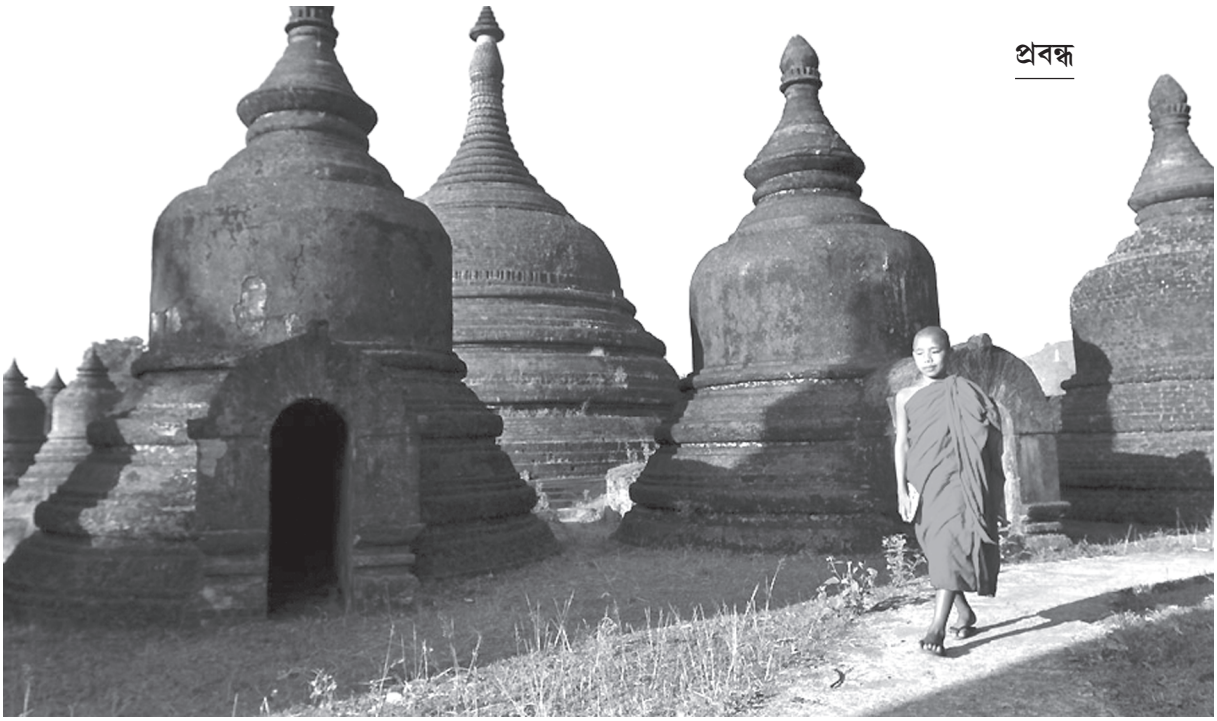

প্রবন্ধ

রাখাইন প্রদেশের ম্রক-উ প্যাগোডা।

উনিশ শতকের কলকাতায় মগ মন্দির ও তার দেউলিয়া পুরোহিত

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

১৭৬৮ শকের (১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ মাস। কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানির অফিস থেকে বৃষ্টিস্নাত কলকাতায় দুই ভাই ঘোড়ার গাড়িতে জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসনের উদ্দেশে রওনা হলেন। কোম্পানির লিকুইডিশন ঘোষণা করার পর উত্তমর্ণদের সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং গিরীন্দ্রনাথের এটিই ছিল প্রথম বৈঠক। ইংল্যান্ডে পিতার মৃত্যুর পর বিপুল ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে প্রায় দেউলিয়া খাতকে পরিণত হয়েছিলেন তাঁরা। পাওনাদারদের সঙ্গে সেদিনের বৈঠক ভালোভাবে মিটলেও দেবেন্দ্রনাথের মনের ভয় তবু কাটেনি। বাড়ি ফেরার পথে দেবেন্দ্রনাথ তাই তাঁর ছোট ভাইকে বলেছিলেন, 'ঈশ্বর ও ধর্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন ইনসলভেন্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়।'

সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই দেউলিয়া বা ইনসলভেন্ট হওয়ার ঘটনা যেমন প্রভূত ঘটত, তেমনই ভয়াবহ ছিল তার পরিণামও। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড (১৮৫০) খ্রি.) বা হার্ড টাইমস্ (১৮৫৪ খ্রি.)-র কথা মনে পড়ছে? ডিকেন্স তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে দেউলিয়া মানুষজনের প্রতি অবিচার-অত্যাচারের কথা মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিকের এইসব কাহিনি অনেকটাই তাঁর

নিজ জীবনসম্ভূত। কারণ ডিকেন্সের বাবাকেও তাঁর বাল্যকালে দেউলিয়া অবস্থায় জেলে যেতে হয়েছিল। যে কারণে ছেলেবেলায় প্রথাগত পড়াশোনা বন্ধ করে ডিকেন্সকে কারখানার কাজে যোগ দিতে হয়। সেই যুগে দেবেন্দ্রনাথ বা ডিকেন্সের মতো বহু মানুষেরই জীবন বদলে যেত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেউলিয়া ঘাতক আইনের নানা অমানবিক ধারা-উপধারার জাঁতাকলে।

সম্প্রতি উনিশ শতকে কলকাতায় স্থাপিত 'মোকাম কলকাতার গোত্রহীন কব্জ দারানের উপকারার্থে আদালত' বা 'দ্য কোর্ট ফর দ্য রিলিফ অব ইনসলভেন্ট ডেটরস অ্যাট ক্যালকাটা'তে পরিচালিত একটি মামলার কিছু নথি আমাদের হাতে এসেছে। এই মূল্যবান নথিগুলি যে কেবলমাত্র সে যুগে কলকাতায় স্থাপিত দেউলিয়া ঘাতক আদালতের কাহিনিই উন্মোচিত করেছে তাই নয়, এর মাধ্যমে আমরা তৎকালীন কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের ও অধুনা অজানা এক অধ্যায় সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ভারতের তিন প্রেসিডেন্সি শহর কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজে প্রথম দেউলিয়া ঘাতক আইন চালু হয়। ১৮০০ সালে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জের আমলে গৃহীত ভারত শাসন আইনের ২৩ এবং ২৪ ধারা ছিল এই বিষয়ে। ফোর্ট উইলিয়ামের অন্তর্গত সুপ্রিম কোর্টকে কলকাতায় এই সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারতের জন্য দেউলিয়া বিষয়ক এই আইনটি ব্রিটেনের ১৭৫৯ সালের আইনের অনুকরণে তৈরি হয়েছিল।

১৮০০ সালে এই বিষয়ে প্রাথমিক আইন তৈরি হলেও বাস্তবিক ১৮২৮ সালে এই আদালতের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি এই আদালতের প্রধান ছিলেন এবং প্রথম থেকেই এই আদালতের একটি স্বতন্ত্র, পৃথক অস্তিত্ব বজায় ছিল। দেউলিয়া বিষয়ক আদালত বোম্বে এবং মাদ্রাজ শহরে প্রয়োজন অনুসারে বসত। কিন্তু কলকাতায় এই আদালত সাধারণত প্রতি মাসের প্রথম শনিবার বসত। ১৮২৮ সালের এই আইনে প্রথম বড় পরিবর্তন আসে ১৮৪৮ সালে। যে আইনে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে নিয়ম পৃথকীকরণের সংস্থান রাখা হয়। এরপর এই আইনটির ভিতর অল্প-বিস্তর পরিবর্তন মাঝে মাঝে এলেও আলোচ্য আইনটির আয়ু ছিল দীর্ঘ এবং আইনটি ১৯০৯ সালে এই সংক্রান্ত পরিবর্তিত আইন লাগু হওয়ার আগে পর্যন্ত এদেশে বলবৎ ছিল। বর্তমানে আলোচ্য দেউলিয়া খাতক আদালতের পূর্বে উল্লিখিত মামলার নথিগুলি ১৮৫২ সালের। অর্থাৎ এই আলোচ্য মামলাটি পরিচালিত হয়েছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার একাদশ রাজ্যবর্ষ ১৮৪৮ সালের আইন অনুসারেই।

আলোচ্য নথিগুলি থেকে জানা যায়, জনৈক লক্ষ্মীচরণ ঠাকুরের কথা। যার বসবাস ছিল মোকাম কলকাতার মিয়াজান্নে গলিতে। এই স্থানে তৎকালে একটি মগ বা বার্মিজ মন্দির ছিল। এই মন্দিরেরই পূজারি ছিলেন লক্ষ্মীচরণ। আদালতি নথিতে লক্ষ্মীচরণকে গাঁউ (Kowan) (কমা) পূজারী (Priest) বলা হয়েছে। কলকাতা গেজেটে এই মামলা সংক্রান্ত আদেশের যে সারাংশ প্রকাশিত হয়, তাতে আবার লক্ষ্মীচরণকে গাঁউ অথবা প্রিস্ট বলা হয়েছে। বার্মিজ ভাষায় গাঁউ শব্দের অর্থ প্রধান বা চিফ। কোনোভাবেই 'পূজারী' নয়। তাই আদালতি নথিতে গাঁউ, পূজারী অথবা পূজারীর প্রতিশব্দ হিসেবে গাঁউয়ের ব্যবহার আভিধানিক অর্থে সঠিক নয়। মনে হয় বার্মিজ শব্দ গাঁউয়ের সঠিক অর্থ না জানায় ইংরাজ আদালতের নথিতে এই বিভ্রান্তি।

লক্ষ্মীচরণের এই মামলাটি প্রথম আদালতে ওঠে ১৮৫২ সালের ৩ জুন। মামলা সংক্রান্ত নথি থেকে জানা যায়, জনৈক মোহরচাঁদ বাবুর্চির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া খাতক লক্ষ্মীচরণ সেই সময় কলকাতার সাধারণ কারাগারে বন্দি ছিলেন। সেই কারণে ঋণগ্রস্ত লক্ষ্মীচরণ বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের আশায় খাতক আদালতে আবেদন করেন।

উপরিল্লিখিত তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায়ের প্রতি আলোকপাত করে। কলকাতার সূচনালগ্ন থেকেই এই নগরের বিশ্বজনীন আবেদন সার্বজনীন। পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির মানুষ চিরকালই এই শহরকে আপন বলেই মনে করেছে। তাই মগ জনগোষ্ঠীও এই শহরের আকর্ষণে এখানে বসবাস করতে আসবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এই সুযোগে মগ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে একটু চর্চা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার একটি প্রচলিত প্রবাদ হলো 'মগের মুলুক'। অরাজকতা বোঝাতে অনেক সময়ই এই প্রবাদ আমরা ব্যবহার করে থাকি। এখন প্রশ্ন, কারা ছিল মগ আর কোথায়ই বা ছিল তাদের মুলুক? ইতিহাস বলছে, এই মগের মুলুকের উত্তর সীমানা হলো উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ। দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর-পশ্চিমে বাংলাদেশ এবং পূর্বে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সীমানা নির্ধারণকারী রাখাইন পর্বতমালা। এই ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম হলো 'রাখাই'। যার উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ রক্ষ এবং যক্ খো (পালি) বা যক্ষ (সংস্কৃত) শব্দ থেকে।

এই দেশের মানুষেরা নিজেদের 'রাখাঁই তেজ্ঞী' বলে অভিহিত করতেন। মধ্যযুগে চট্টগ্রামবাসীরা রাখাঁই-র রাজধানী ম্রিয়া-উ কে রোসাং বলতেন। ব্রিটিশ শাসনকালে উচ্চারণের আরও পরিবর্তনে এই অঞ্চল 'আরাকান' নামে পরিচিত হয়। ব্রিটিশ অভিধা ছেড়ে বর্তমানে এই অঞ্চল রাখাইন নামে পরিচিত। খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ ২৬৬৬ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় রাখাইন

কম-বেশি একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্মী রাজা বোধফয়া (১৭৮২-১৮১৯ খ্রি.) স্থায়ীভাবে এই অঞ্চলকে জয় করে ব্রহ্মদেশে সংযুক্ত করেন।

রাখাইনের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজোয়াং' থেকে জানা যায়, ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে মগধের জনৈক সান্দাতুরিয়া (চন্দ্রসূর্য) নামক এক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন। উত্তর রাখাইন এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বৃহৎ অংশ যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। চন্দ্রসূর্য বংশের প্রথম রাজধানী ছিল রাখাইনের ধান্যবতী। মগধ আগত এই জনগোষ্ঠীই পরবর্তীকালে মগ বা মঘ নামে পরিচিত হয়। এই অঞ্চলের মোঙ্গলয়েড নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে মগধের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও কালক্রমে বাঙালিরা রাখাইনের সকল অধিবাসীদেরই মগ নামে অভিহিত করতে থাকে। সম্ভবত রাখাইনের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের প্রসারই এর মূল কারণ ছিল। অপর একটি মতে মগ শব্দ এসেছে মোঙ্গল নৃগোষ্ঠী থেকে। এই মতটি আমাদের কাছে খুব একটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। পণ্ডিতদের মতে, মগ শব্দটি একটি বাংলা শব্দ। রাখাইন বা মায়ানমারের অভিধানে এই শব্দটি কোনোদিনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

মধ্যযুগে বাংলার সঙ্গে রাখাইনের সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই সময়ে ক্ষমতা দখলের সাপ-লুডো খেলায় কয়েক শতক জড়িয়ে পড়ে ব্রহ্ম-সম্রাট, রাখাইন-রাজ, গৌড় রাজ-দরবার, দিল্লির মুঘল শাসকবৃন্দ, এমনকি পর্তুগিজ জলদস্যুরাও। খ্রিস্টাব্দ পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মোঙ্গলয়েড মগেরা কখনো আলাদা কখনো পর্তুগিজদের সঙ্গে মিলে বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলা সমূহে জলদস্যুরূপে ভীষণ রকম উপদ্রব করেছিল। পর্তুগিজরা মগেদের সহায়তায় বাংলার উপকূলে আক্রমণ চালিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের দাস হিসেবে বন্দি করে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজধানী বাটাভিয়ায় বিক্রি করতো।

মগেরা নিজেদের প্রয়োজনেও বাঙালি ক্রীতদাসদের ব্যবহার করতো বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরাকানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হলো কালাডান। বার্মিজ ভাষায় 'কালা' শব্দের অর্থ বিদেশি ভারতীয় আর 'ডন' শব্দের অর্থ স্থান। অর্থাৎ বিদেশিদের বাসস্থান। আসলে এই কালাডান নদীর উপত্যকায় মগেরা বাংলাদেশ থেকে দাস হিসেবে অপহরণ করে আনা মানুষদের ধান উৎপাদনের জন্য ভূমিদাস হিসেবে ব্যবহার করতো। বিদেশি দাস-ভারতবাসীর আবাসভূমি বলেই মগেরা এই নদীর নাম দেয় কালাডান। তাই এইসব কারণে বাঙালির মোঙ্গলয়েড মগেদের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বাংলা ভাষা সাহিত্যের মতো কিছু বিষয়ে তাদের অবদানও স্মরণীয়। সে কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

বাংলার প্রথম নিয়মমাফিক আদমসুমারি হয় ১৮৭২ সালে। এইচ বেভেরেলি সাহেবের সংকলিত এই রিপোর্ট থেকে জানা যায়, অবিভক্ত বাংলায় সেইসময় মগ অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৫৬ হাজার ছশো সতের জন। মগ জনসংখ্যার বেশিরভাগই পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। চব্বিশ পরগনা জেলায় এই সংখ্যা ছিল ২৩২ জন। কলকাতার জনসংখ্যাও এই চব্বিশ পরগণার ভিতরই ছিল। তাই একথা ধরে নেওয়া যেতেই পারে, জীবিকার কারণে এই ২৩২ জন মগ অধিবাসীর বেশিরভাগই থাকতেন দেশের রাজধানী কলকাতাতেই।

এখন প্রশ্ন হলো, এই মগ জনগোষ্ঠী কলকাতার কোন অঞ্চলে থাকত আর কী-ই বা ছিল তাদের জীবিকা? এ জি রুস্যাগ কোম্পানির ১৮৫৬ সালের 'দ্য নিউ ক্যালকাটা ডিরেক্টরি ফর দ্য টাউন অব ক্যালকাটা'র সূত্রে জানা যায়, মগেরা এই সময় মধ্য কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতো। এই সকল অঞ্চল প্রথম থেকেই মিশ্র জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। বাসস্থান হিসেবে মগেদের

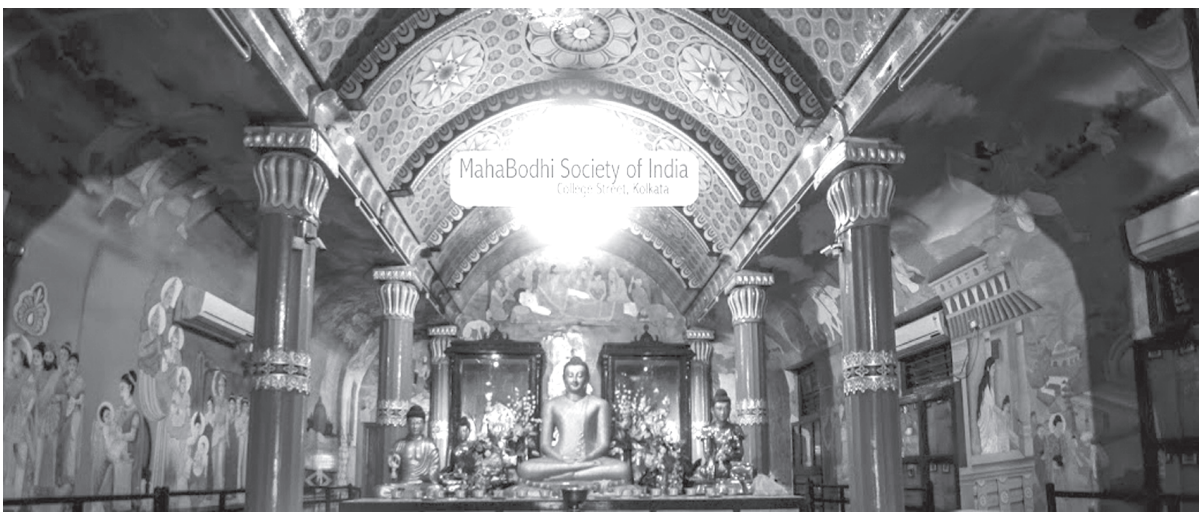

মহাবোধী সোসাইটি, কলকাতা।

With Best Compliments from :-

A

Well

Wisher

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

দ্বারকানাথ ঠাকুর

কলকাতার এই অঞ্চল বেছে নেওয়ার পেছনে তাদের কর্মক্ষেত্রের অবস্থানই গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়। কারণ, এই সকল অঞ্চল থেকে ইউরোপীয়ানদের জনবসতি খুব দূরে অবস্থিত ছিল না।

সেকালের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, কলকাতায় মগেদের মূল উপজীবিকা ছিল পাচকের কাজ। আসলে দীর্ঘদিন পর্তুগিজদের সঙ্গে অবস্থানের কারণে মগেরা বেশ খানিকটা ইউরোপিয়ান রন্ধনপ্রণালী সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। তাই নেই মামা ইউরোপিয়ান শেফের বদলে কানা মামা মগেরা সেইসময় পাচক হিসেবে চাকরি পেত কলকাতার বিভিন্ন বিদেশি পরিবারে। পর্তুগিজ রন্ধনপ্রণালী, মূলত দেশি মশলা আর আরাকানি পাচকের হাতের গুণ— সব মিলিয়ে কলাকাতায় ইউরোপিয়ানদের নিশ্চিতভাবে এসব রান্না স্বাদ বদলের নতুনত্বে মন্দ লাগত না। এমনকি একথাও শোনা যায়, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব তাঁর বাড়ির ভোজসভায় সাহেবদের ইউরোপিয়ান খানা পরিবেশনের জন্য মগ রাঁধুনি নিযুক্ত করেছিলেন।

আদালতি নথিতে লক্ষ্মীচরণের বাসস্থান হিসাবে কলকাতার মিয়াজান্নে গলির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত 'দ্য বেঙ্গল অ্যান্ড আগ্রা ডায়রেক্টরি'তে জিগ-জ্যাগ লেনের সঙ্গে একই বন্ধনীতে মির জানি গলি নামক এক রাস্তার উল্লেখ প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। এই রাস্তাটি কসাইটোলার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ১৮৫৬ সালের 'নিউ ক্যালকাটা ডায়রেক্টরি'তে আবার এই রাস্তার নাম ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে মিয়াঁজান কা গল্লি হিসাবে নথিভুক্ত হয়েছে। এই রাস্তাটিও জিগ-জ্যাগ লেনের সন্নিহিত ছিল। ১৮৫৬ সালের এই ডায়রেক্টরিতে আবার মিয়াঁজান কা গল্লির পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে ওয়েস্টন লেন। এখানে ওয়েস্টন লেনে কয়েকটি মগ কুটিরের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৮৬২ সালের 'ক্যালকাটা ডায়রেক্টরি'তে আবার ওয়েস্টন লেনের নেটিভ নাম মিয়াঁজান কা গল্লির বদলে 'বন্দুকওয়ালা গল্লি' দেওয়া হয়েছে। আজও এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা ওয়েস্টন লেনকে 'বন্দুক গলি' বলে অভিহিত করে থাকেন। ১৮৬২-র এই ডায়রেক্টরিতে আমরা আবার পার্শ্ববর্তী বউবাজার লেনেও সাতটি মগ পাচক কুটিরের সন্ধান পাই। পূর্বে উল্লিখিত ওয়েস্টন লেনই ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে ওয়েস্টন স্ট্রিট।

মধ্য কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে পুব-পশ্চিম বিস্তৃত এই রাস্তাটির বর্তমানে পূর্ব দিকের সূচনা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে। পশ্চিমে যার সমাপ্তি বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে। পূর্বদিকে এই রাস্তার প্রথম অংশের নাম আজ কপালিটোলা লেন। এখানে কপালিপল্লির প্রতিষ্ঠাতা দাস পরিবারের আজও বাসস্থান।

এই কপালিটোলা লেনকে প্রথম যে রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে ছেদ করেছে তার নাম রবার্ট স্ট্রিট। রবার্ট স্ট্রিটের পরবর্তীতে কপালিটোলা স্ট্রিট থেকে যে রাস্তাটি কেবলমাত্র উত্তরমুখী বর্তমানে তার নাম বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রিট। যেখানে আজ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা বা দ্য বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অবস্থিত। বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রিটের সামনেই অধুনা বিখ্যাত বো-ব্যারাক আর কপালিটোলা পার্ক ওরফে নালন্দা উদ্যান অবস্থিত। এই উদ্যানের পরেই অপর এক উত্তরমুখী রাস্তা বো স্ট্রিট যার সমান্তরাল দক্ষিণমুখী অংশের নাম আবার খইরু প্লেস।

এই বো স্ট্রিটের পর থেকেই পূর্ব-পশ্চিমের প্রধান রাস্তাটি বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পড়া পর্যন্ত আজও ওয়েস্টন স্ট্রিট নামে অভিহিত। কলকাতার আদি যুগে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের নাম ছিল কসাইটোলা। পূর্বে উল্লিখিত দুটি ক্যালকাটা ডায়রেক্টরিতেই আমরা মিয়াঁজান কা গল্লি বা ওয়েস্টন লেনের পশ্চিমে সীমানা হিসেবে এই কসাইটোলাকেই দেখতে পাই।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট এবং বো স্ট্রিটের মাঝে ওয়েস্টন স্ট্রিটকে ছেদ করে উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত আর একটি পূর্ণ রাস্তা দেখা যায়। বর্তমানে যার নাম মেটক্যাফ স্ট্রিট। ১৮৫৬ সালে এই রাস্তাটি স্থানীয় মানুষজনের কাছে পরিচিত ছিল কিং কুপার কা গল্লি হিসেবে। ১৮৪৭-১৮৪৯ সালে জে সি ওয়াকার কোম্পানির তরফে ফ্রেডরিক ওয়াল্টার সিমস, এইচ এল থুইলার ও আর স্মিথের কলকাতার মানচিত্রে এই রাস্তাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে জিগ-জ্যাগ

লেন হিসেবে উল্লেখিত হচ্ছে। ওয়েস্টন স্ট্রিট ও মেটক্যাফ স্ট্রিটের একই স্থানে বর্তমানেও অবস্থিতি নিশ্চিত করে চিহ্নিত করে লক্ষ্মীচরণের সেযুগের বাসস্থান তথা মগ বা বার্মিজ মন্দিরের সঠিক অবস্থানকে। যার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, বর্তমান কপালিটোলা পার্ক থেকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মধ্যবর্তী ওয়েস্টন স্ট্রিটের কোনো স্থানেই অবস্থিত ছিল পূর্বোল্লিখিত মন্দিরটি।

লক্ষ্মীচরণের মামলার নথিগুলি নিশ্চিতভাবে উনিশ শতকের কলকাতার একটি অজানা অধ্যায়ের প্রতি আলোকপাত করে। সেই সময় কলকাতায় মগ সম্প্রদায় যে কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা এতদিন আমাদের অজানা ছিল। আদালতের এই সমস্ত অজ্ঞাত নথি ছাড়া অন্য কোথাও যার নির্দিষ্ট উল্লেখ এখনও পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। এই মন্দিরটি নিশ্চিতভাবেই একটি বৌদ্ধ উপাসনালয় ছিল। সেই হিসাবে সম্ভবত অধুনালুপ্ত ওই উপাসনালয়টি ছিল কলকাতায় স্থাপিত প্রথম বৌদ্ধ মন্দির। আমাদের মনে হয় তৎকালীন কলকাতায় মগ পাচকদের দ্বারা নির্মিত কোনো পর্ণকুটিরেই সেই সময় স্থাপিত হয়েছিল এই মন্দিরটি।

যদি আমরা মেনে নিই আলোচ্য মন্দিরটি একটি বৌদ্ধ উপাসনালয় ছিল, তাহলে স্বভাবতই আমাদের মনে যে প্রশ্ন ওঠে তা হলো— লক্ষ্মীচরণ ঠাকুর এই মন্দিরের পূজারী হন কীভাবে? কারণ লক্ষ্মীচরণের নাম-পদবী ও মগ-সংস্রব থেকে আমাদের প্রাথমিক অনুমান তিনি সম্ভবত বাঙালি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁর আদি নিবাস ছিল চট্টগ্রাম। লক্ষ্মীচরণ কলকাতায় কাজের খোঁজে এসে এই মগ মন্দিরে পূজারী হিসেবে নিযুক্ত হন। নাকি তাঁকে এই বৌদ্ধ মন্দিরের পূজারী হিসেবেই চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় আনা হয়েছিল, তা বোধহয় আজ আর জানা সম্ভব নয়। মগ-বার্মিজ প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মন্দিরের হিন্দু ব্রাহ্মণ পূজারী আপাত আশ্চর্যের মনে হলেও রাখাইন তথা ব্রহ্মদেশের ধর্মীয় পরম্পরার ইতিহাস জানা থাকলে সেই যুগের এই ঘটনা বিস্ময়কর বলে মনে হবে না।

এখন অল্প কথায় জেনে নেওয়া যাক, রাখাইন বৌদ্ধ পরম্পরার সেই ইতিহাসকে। প্রাচীন রাখাইন ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা চন্দ্রসূর্য রাখাইনের তৎকালীন রাজধানী ধান্যবতীতে মহামুনি বুদ্ধমূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কথিত আছে সেইসময় মহামুনির পূজা করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার ও তাঁদের সেবকরূপে একটি শূদ্র পরিবারকে ধান্যবতীতে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজা চন্দ্রসূর্য ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিন্তু পরবর্তীতে রাখাইনে থেরোবাদ প্রতিষ্ঠিত হলেও এই পরম্পরার অবসান হয়নি। পর্তুগিজ পাদরি মানরিকের (১৫৯০-১৬৬৯) বিবরণ থেকে জানা যায়, রাখাইনের শাসকদের রাজ্যাভিষেক, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠান হিন্দু ব্রাহ্মণদের তদারকিতেই অনুষ্ঠিত হতো। রাজার শ্বেতহস্তী পালনের কাজও তাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। এছাড়া রাজ পরিবারের আনন্দ-উৎসব, ধর্মীয় কাজের তদারকি ও ভাগ্যফল গণনার কাজও তাঁরাই করতেন। এইজন্য রাখাইনের রাজ দরবারে একদল ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বোধফয়া রাখাইন জয় করলে তাঁর পুত্র ৩৮ হাজার রাখাইন বন্দির সঙ্গে মহামুনি বৌদ্ধমূর্তি, সেখানকার পূজারী ব্রাহ্মণের বংশধর ও শূদ্রসেবকদের বংশধরদের ব্রহ্মদেশের তৎকালীন রাজধানী মান্দালয়ে নিয়ে যান। হিন্দু ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মদেশে 'পৌনা' বলা হয়ে থাকে। বর্তমান লেখক কিছুদিন আগে মান্দালয়ের মহামুনি প্যাগোডায় এই রাখাইন পৌনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন।

শুধু রাখাইন নয়, ব্রহ্মদেশের অন্যত্র ছোট-বড় ভূস্বামীবৃন্দও সেই সময় তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে এই পৌনাদের নিযুক্ত করতেন। ব্রহ্মদেশের শেষ সম্রাট থিবো (রাজত্বকাল ১৮৭৮-১৮৮৫)-র মান্দালয় রাজদরবারেও এই পৌনাদের অবস্থানের কথা জানা যায়। তাই কলকাতার মগ-বৌদ্ধ মন্দিরে হিন্দু ব্রাহ্মণ হিসেবে লক্ষ্মীচরণের নিযুক্তি সেই প্রাচীন পরম্পরারই অনুসারী ছিল, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে।

এবার লক্ষ্মীচরণের মামলার মূল কাহিনিতে আসা যাক। আগেই বলেছি, অর্থ অনাদায়ে জনৈক মোহরচাঁদ বাবুর্চির অভিযোগে লক্ষ্মীচরণকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। মোহরচাঁদের নাম দেখে তার ধর্ম ও পেশা সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। কিন্তু মোহরচাঁদ কত টাকা এবং কেন তা লক্ষ্মীচরণকে ঋণ দিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই। যেমন জানা নেই ঠিক কবে লক্ষ্মীচরণকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেহেতু আদালতে ৩ জুন, ১৮৫২ সালে প্রথম লক্ষ্মীচরণকে পেশ করা হয়, স্বাভাবিকভাবেই তার অল্প কিছুদিন আগেই লক্ষ্মীচরণ গ্রেপ্তার হন— এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এই দিন বিচারপতি তাঁর আদেশে লক্ষ্মীচরণের মামলা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র আদালতে জমা দিতে বলেন। লক্ষ্মীচরণের এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পিলের অধীনে ছিল। স্যার লরেন্স তাঁর আদেশে আরও বলেন একমাসের ভিতর লক্ষ্মীচরণের দেউলিয়া সংক্রান্ত মামলার নোটিস তাঁর সকল উত্তমর্ণদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এই একমাসের ভিতর কোর্টের আদেশের সারাংশ ক্যালকাটা গেজেটে দু'বার প্রকাশ করতে হবে। আদালত এই মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ জুলাই মাসের ৩ তারিখে ধার্য করে।

মামলার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ৩ জুলাই প্রধান বিচারপতি মূল বাদী মোহরচাঁদ বাবুর্চিকে ৭ আগস্ট সকাল এগারোটায় সশরীরে আদালতে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেন। একইসঙ্গে তিনি কলকাতার শেরিফকে এ বিষয়ে নোটিস জারি করতে বলেন। লক্ষ্মীচরণের ততদিন পর্যন্ত জেলে থাকার নির্দেশই বহাল থাকে।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলকাতা।

৭ আগস্ট, শনিবার মামলার তৃতীয় শুনানিতে মোহরচাঁদের পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী কেভি। কেভি বিচারালয়ের কাছে লক্ষ্মীচরণের দেউলিয়া ঘোষণার আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রধান বিচারপতি পিল নাইট এই মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখ পর্যন্ত মুলতুবি রাখেন।

৪ সেপ্টেম্বর কোর্টের আদেশে আরও কয়েকজন বন্দির সঙ্গে লক্ষ্মীচরণ অবশেষে মুক্তিলাভ করে। অর্থাৎ লক্ষ্মীচরণের আবেদন বিবেচনা করে বিচারপতি তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করে আর্থিক দায় থেকে মুক্ত করেন। লক্ষ্মীচরণের মুক্তির এই আদেশটিও ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়।

কলকাতার জেলে চার মাসের উপর বন্দি থাকার পর লক্ষ্মীচরণ এই শহরেই থেকে গিয়েছিলেন না এখান থেকে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে গিয়েছিলেন তা আমাদের জানা নেই। সুদুর রাখাইন থেকে কলকাতায় এসে মগ জনগোষ্ঠীর তৈরি প্রথম বৌদ্ধ মন্দিরটি এরপর কতদিন টিকে ছিল সেকথাও আজ জানার কোনো উপায় নেই। তবে ১৮৫২ বা তৎপূর্ববর্তী সময়ে যে স্থানে কলকাতার প্রথম বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রায় সেখানেই ১৮৮৮ সালে ২১/২৬ বো স্ট্রিটে চট্টগ্রাম থেকে আগত কৃপাশরণ মহাস্থবির 'মহানগর বিহার' স্থাপন করেন। যা আজও ওই অঞ্চলে নবকলেবরে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা হিসেবে স্বমহিমায় বিরাজমান। এই ধর্মাঙ্কুর সভায় পরবর্তীকালে রাখাইন বৌদ্ধমঠের সঙ্ঘনায়ক উপুঙ মহাস্থবির কৃপাশরণকে অষ্টধাতু নির্মিত অপরূপ একটি বৌদ্ধমূর্তি দান করেন। মূর্তিটি আজও সেখানে বিদ্যমান।

কলকাতায় উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে মগ জনগোষ্ঠীর দ্বারা প্রথম বৌদ্ধমন্দির স্থাপিত হলেও সেই মন্দিরের প্রথম পুরোহিত ছিলেন বাঙালি। আবার পরবর্তীকালে সেই স্থানেই বাঙালি বৌদ্ধস্থবির প্রতিষ্ঠিত মঠে রাখাইন সংঘ নায়কের বুদ্ধমূর্তি দান সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক অসমাপ্ত বৃত্তকেই যেন সম্পূর্ণ করে।

নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও বাংলার সঙ্গে রাখাইনের, বাঙালির সঙ্গে রাখাইনবাসীর এই মেলবন্ধন সুদুর ঐতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রবাহমান। লক্ষ্মীচরণ, কৃপাশরণ বা উপুঙরা হলেন তারই প্রতীক। ▌

চিহ্নায়ন

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত

আকাশ ও মেঘের মতিগতির ওপর অধিক আস্থা স্থাপন যে ভারী কাঁচা কাজ, দিনের শুরুতেই তা বোঝা গেল। ফ্ল্যাটবাড়ির ঝুলবারান্দায় বসে লুচি আর মোহনভোগ রসিয়ে রসিয়ে যখন খাচ্ছে অনুত্তম, আঁখি তখন সেখানে দাঁড়িয়েই সান্ধ্য আবেগে আকাশের দিকে চেয়ে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল, 'দ্যাখো, আকাশের বুকে যেন কতবড় রুপোর থালা। কী আলো!'

অনুত্তমকে মুখ তুলতেই হয় এবং যেহেতু তার দৃষ্টি সবসময় ভালোর সঙ্গে মন্দকেও খোঁজে, তাই বলেছিল, 'রুপোর থালা ঠিকই, কিন্তু ওই থালার চারদিকে যে কিছু মেঘ সুজির হালুয়ার মতো দলা পাকিয়ে রয়েছে, সেটাও কিন্তু খেয়াল করা উচিত। লক্ষণ ভালো নয়।'

অনুত্তমের ইঙ্গিত যে নির্ভেজাল, আঁখি সেটা টের পেল ভোর হবার আগেই। রাতে আবহাওয়া দপ্তর নাকি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, 'ঝড়ঝঞ্ঝা মারাত্মকভাবে আসছে পশ্চিম থেকে। নামও তার 'মুসিবত'। মুসিবতের হুটোপাটি সেই যে শুরু হয়েছিল, এখনও তাতে ক্ষান্তি নেই। অনেকদিন বাদে শিলাবৃষ্টি। এপার ওপার একাকার। দিনের আলো এমন মলিন যে দৃষ্টিবিভ্রমের আশঙ্কা। অনুত্তম ও আঁখি দুজনেরই মনে হচ্ছে, তারা নিছক একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে রয়েছে বুঝি। খুব দরকার না থাকলে এই মুহূর্তে একমাত্র মতিচ্ছন্নরাই বাড়ির বাইরে পা রাখে। এখনও বাতাস কমবেশি দামাল। কলকাতা শহরের কোথায় কত যে অঘটন ঘটে গেল, কত কী অদল-বদল হলো, তা অনুভব করতে খুব একটা দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। টিভির স্ক্রিনে সকল বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় না। অথচ কাল তারা রুপালি চাঁদকে সাক্ষী রেখে কী সরস পরিকল্পনা ফেঁদেছিল। প্রকৃতির রোষ না রসিকতা সব ভজঘট পাকিয়ে দিয়ে গেল।

পরের দিনটা তো রবিবার। অনুত্তমের অফিস যাবার তাড়া নেই। ছেলে রনি নিউজার্সিতে। সুতরাং এই রবিবারটাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে আঁখি ও অনুত্তম গেঁথে রেখেছিল গুটিকয়েক সম্ভাব্য কর্মসূচি। এদের মধ্যে অন্যতম হলো শক্তিগড়ে গিয়ে ল্যাংচার আস্বাদন। কত মস্ত মস্ত ব্যক্তিত্ব সময় থেকে সময়ান্তরে শক্তিগড় গিয়ে ল্যাংচা খেয়ে শংসাপত্র দিয়ে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বোস থেকে আরম্ভ করে উত্তমকুমার অবধি। শক্তিগড়ে ল্যাংচাপর্ব সেরে চলে যাবে কার্জনগেটে— বঙ্গভঙ্গের অপরাধী লর্ড কার্জনের সম্মানে বর্ধমানের মহারাজার অবদান। সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে দেখবে বর্ধমানের অন্যতম দ্রষ্টব্য ১০৮ শিবমন্দির। তারপর...। চিটেগুড়ের মতো লেগে ছিল একটার সঙ্গে আর একটা পরিকল্পনা। প্রকৃতির মন্দবাজনা সব ভণ্ডুল করে দিল। সরকারি বাসের একজোড়া টিকিটও কেটে এনে রেখেছিল অনুত্তম। অনুত্তমের কোনো চারচাকার ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, যদিও সে একজন পদস্থ পুলিশ গোয়েন্দা, এযাবৎ বজ্জাতদের বহু হাট তছনছ করে দিয়েছে। রাজনীতির টোপ গেলার লোভকে সংবরণ করতে পেরেছে। হরদম বিবেক ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। তাই গোরাবাজার এলাকায় এরকম একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট তার। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে হয়েছে। গাড়ি কেনার রেস্ত জোগাবে কে? এই নিয়ে আঁখির এলোমেলো কিছু অনুযোগ থাকলেও অনুত্তমের কিন্তু এ অবধি মনে হয়নি, একটা চার চাকার অভাবে তার জীবন থেকে সব জোছনা কেউ শুষে নিয়েছে। যতদিন চাকরি আছে, গাড়ির অভাব তেমন ঠাহর করতে পারবে না। তারপর যদি খুব অসুবিধা হয়, ভাববার অবকাশ থাকবে। প্রয়োজনে ছেলের কাছে হাত পাতবে।

এখনও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পথে নামলে অথৈ জলে খাবি খায় না। বাস, ট্রাম, অটো, টোটো, ট্যাক্সি এসব তো একেবারে অলভ্য নয়। মোদ্দা কথা, প্রৌঢ় দম্পত্তি কলকাতার সরকারি বেসরকারি যানবাহনের সঙ্গে এখনও দিব্যি মানিয়ে নিতে পারছে। আরও একটা ব্যাপার আছে, বাস বা অটো যখন ছোটে, অনুত্তমের ভেতরে একটা শিরশিরে বাতাসও যেন বইতে থাকে। সে পার্শ্ববর্তী সহযাত্রীকে সামান্য জরিপ করে নেয়। যেন তার তৃতীয় নয়নটি জেগে ওঠে। পোয়াটাক রাস্তা পার হতে না হতেই জলজ্যান্ত, কিন্তু অপরিচিত মানুষটার সম্পর্কে বেশ কিছু বিবরণ দিতে পারে। যেগুলি প্রায়শই নির্ভুল হয় অথবা সত্যের কান ঘেঁষে চলে যায়। একবার বাসের মধ্যে কোনাকুনি বসে থাকা আঁখির এক বান্ধবী সম্পর্কে অনুত্তম এমন একটি কথা বলেছিল, যা আঁখিকে যুগপৎ সচকিত ও ব্যথিত করে; কিন্তু মন্তব্যটাকে উড়িয়েও দিতে পারেনি।

এহেন অনুত্তম চৌধুরীকে আঁখি চৌধুরীও মনে মনে সমীহ না করে পারে না। তো সে যাই হোক, এখন তারা দু'জনই বিমর্ষ। একটা মধুর সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে ছাড়ল অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ। প্রকৃতি তার নিজস্ব মৌনতাকে বিসর্জন দিয়ে এখনও এমন গজরাচ্ছে যে হতাশায় আঁখি হাতের চিরুনিটাকে দূরে নিক্ষেপ করে। অনুত্তম সেটা আবার তুলে এনে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখে। একবার তাদের মনে হয়েছিল, ছাতা মাথায় দিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? পরক্ষণেই তারা স্বীকার করে নেয়, এ ধরনের বিলাসিতা করবার বয়স দুজনেরই পেরিয়ে এসেছে। পরিস্থিতি যখন আরও থমথমে হয়ে উঠছে, ঠিক তখন আঁখির থ্রি জি মোবাইলটা পল রবসনের গান গেয়ে ওঠে, 'উই আর অন দ্যা সেম বোট ব্রাদার...'

স্ক্রিনের দিকে চেয়ে ঈষৎ উৎফুল্ল আঁখি জানায়, 'মামা ফোন করছেন।'

'মামা!'

'হ্যাঁ, মামা।'

মুহূর্তে তাদের চেতনায় ঘা লাগে— অনুত্তমের লেখক-মামা তার হাজার স্কয়ার ফিটের মডার্ন ফ্ল্যাটটিতে একা— সম্পূর্ণ একাই রয়েছেন। তাঁর দিকে নজর দেবার মতো কেউ নেই গত তিনদিন ধরে। মামা ও মামিমার জন্য রেলের টিকিট কেটে পাঠিয়েছিল তাদের একমাত্র কন্যা সুলেখা রায়গড় থেকে। জামাতা ছত্তিশগড়ের পদস্থ সরকারি আধিকারিক। গত তিন

বছর ধরে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও মা-বাবাকে আনতে না পারায় সুলেখার খুব অভিমান হয়েছিল। দূরভাষে ব্যথিত গলায় আপন মর্মবেদনা জানিয়েছে ক'বার। তবুও হুঁশ আসেনি মামার। খালি কাগজ আর কলম। কলম আর কাগজ। বুঝতাম লিখে অনেক কামাচ্ছেন বা পুরস্কার-টুরস্কার পাচ্ছেন, তাহলেও সেটা না হয় একটা জোরালো বৃত্তান্তের জন্ম দিত। আর মামি? তিনি দিনের মধ্যে ঘণ্টা কয়েক ঠাকুরের সিংহাসনের সামনেই বিভোর। বাড়িতে কোনো কর্ত্রী আছেন বলেই মনে হয় না। এবার জামাই জোড়া টিকিটি পাঠাতে অপ্রস্তুত। তবুও মামা অনড়। শেষে রেগেমেগে কন্যার মান ভাঙাতে মামি একাই গিয়ে উঠে বসলেন বম্বে মেল ভায়া নাগপুরে। মামা দুঃখিত। নিজের ব্যস্ততার কথা যদি জানাতে বসেন, সেটা অনেকের কাছে হয়ে উঠতে পারে ছোটমুখে বড় কথা। আসলে সত্যি তাঁর ইদানীং লেখক হিসেবে একটু নামডাক হয়েছে। কেবল রহস্য উপন্যাস রচনাতেই নয়, রাজ্যের চোর-ছ্যাঁচড়াদের ওপর একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখালেখি বেশ আলোড়ন তুলেছেন, যদিও তাকে ঠিকঠাক কোনো রাজনৈতিক দলের পতাকার নীচে এনে দাঁড় করানো কঠিন। মেয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে মামির প্রথাসিদ্ধ গজগজানি। '... কী আমার ভুবনখ্যাত লেখকরে। .. আমি চললাম। তোমার হাঁটুর ব্যথা আরও বাড়ুক বসে থেকে থেকে।...'

মামির এই রকম বাক্যবান মামা যেভাবে হাসিমুখে হজম করেন, তাতেই মালুম হয় ওদের দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা। টাকা-পয়সা যতই সামান্য হোক, অনুত্তম কিন্তু তার মাতুলকে একজন বহুমুখী কৃতবিদ্য মানুষ বলেই মনে করে। কুলগৌরবও বলা চলে। ম্যাট্রিকে প্রথম যোলজনের মধ্যে নাম ছিল। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি থাকলেও গবেষণায় মাথা ঘামাননি। অধ্যাপনা ছেড়ে ঢুকে যান একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে। সেখানেও যে উচ্চতায় পৌঁছে যাবার কথা, সেটা হয়নি তৈলমর্দনে পারদর্শিতার অভাবে। এখন মাথার চুল সব সাদা; কিন্তু মামিকে তুষ্ট রাখতে কলপ ব্যবহার করেন নিয়মিত। লিখেছেন বিস্তর। অবসর নেবার পর সেটা আরও বেড়েছে। কিন্তু যে গুণ থাকলে পুরস্কার মেলে, সেই গুণের ও তৎপরতার বড় অভাব। কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে অক্ষম। বিস্তর বইপত্তর নথি ঘেঁটে নিবন্ধ লেখেন। আর উপন্যাস লেখার ব্যাপার হলেই ভাগ্নে সি আই ডি অনুত্তমের থুতনি ধরে নাড়া দেন, 'একটা প্লট দে। রহস্য কাহিনি লিখব। সামাজিক উপন্যাস যদি লিখতে বসি, ধোঁকা দিতে পারব না। ফলে আমার অনেক কিছুকে গড়বড় করে দেবার জন্য বহু প্রভাবশালী পিছনে লাগবে, সাহিত্যের বাজারে এতসব ওজনদার নিন্দুকদের সামাল দেওয়া আমার অসাধ্য।'

অনুত্তম তখন মাথা নাড়ে— মামা, তোমার মেরুদণ্ড যেন জীবনের বাকি দিনগুলিতে এরকম সোজাই থাকে। আমার কাছ থেকে যখন-তখন প্লট পেতে থাকবে।

এহেন মাতুলের সঙ্গে অনুত্তমের বেটারহাফ আঁখি চৌধুরীর এখন ফোনে কী কথাবার্তা হচ্ছে, তা শোনা যাক—

মামা : কে, আঁখি মা?

আঁখি : হ্যাঁ, মামা। আমি তোমার আঁখি।

মামা : কী করছিস রে তোরা দু'টিতে?

আঁখি : কিছুই তো করার নেই মামা। ভয়াবহ আবহাওয়া। আমরা বিলকুল ঘরবন্দি। সারা গোরাবাজার হাবুডুবু খাচ্ছে। পথে বেরিয়েছে, এরকম লোকের সংখ্যা হাতে গুনে বলা যায়। তোমার ওখানে অবস্থা কেমন?

মামা : তফাত ঊনিশ বিশ। তবে ব্যতিক্রম কিছু আছে বৈকি! যেমন আজ সকালে আমাদের হাউসিং কমপ্লেক্সে একটা তাগড়াই দাড়াশ সাপকে দেখা গেছে। তোরা তো এ জিনিস স্বপ্নেও দেখতে পাস না।

আঁখি : বাব্বা! মামা, মামি তো হাওয়া। তুমি এখন করছটা কী?

মামা : গায়ে আমার ময়লা পিরান। টেবিলে কাগজ ও কলম। কিন্তু মাথাটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করেও কোনো বস্তুর খোঁজ পাচ্ছি না। অনুত্তমকে খোঁচাই। আমারই ভীমরতি। গত এক বছরে মাত্র দুটো প্লট দিতে পেরেছে। অন্তত পুজো সংখ্যাগুলির জন্য কিছু মশলা তো চাই।

আঁখি : তোমার ভাগ্নেও এখন আর আগের মতো নেই। রাজনৈতিক জাঁহাবাজদের অসামাজিক দাপট থামাতে না পারায় নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিচ্ছে। প্রসঙ্গ তুলতে গেলে হঠাৎ বাক্য হারিয়ে বসে।

মামা : আরে না। এ সবই হলো নিজেকে একটু বিরাম দেওয়া। যথাকালে বাঘাচোখে তাকাবে। পরিপক্ক মাথায় সৃষ্টি হবে দিব্যদর্শন। অপরাধীদের মুরোদ একসময় শেষ হবেই। দে, একবার ভাগ্নের সঙ্গে কথা বলি।

এরপর মামা-ভাগ্নের দড়ি টানাটানি। সত্যিই বুক ফুলিয়ে বলবার মতো জটিল কেস অনুত্তমের হাতে একটাও নেই। শুধু ষণ্ডাগুন্ডাদের কুকীর্তি নিয়ে বড়সড় অথবা মাঝারি মাপের রহস্যকাহিনি তো দাঁড় করানো যায় না। আর মামা যে জাতের লেখক, মিথ্যা ও কল্পনার পিছু ধাওয়া করবেনই না মরে গেলেও। মামা বললেন, 'করবিটা কী এইরকম একটা দিনে? ল্যাপটপ?'

'অগত্যা।'

'না, তোরা দুজনে চলে আয় আমার কাছে। থাকবি যতদিন তোদের মামি ফিরে না আসছে। তোর সঙ্গ আমার দরকার রে। পুরনো কেসের গল্পই শুনব। সুপারি কিলার, আড়কাঠি, তোলাবাজ এদের নিয়ে উচ্চাঙ্গের রহস্যকাহিনি লেখা সম্ভব না হলেও বর্তমান ছবিটাকে তো তুলে ধরা যাবে। তাই বা কম কী? অতএব, তুই আজ আঁখি মাকে নিয়ে আমার এখানে আসছিস। অবশ্যই আসছিস। আমি সুবলকে দিয়ে গাড়ি পাঠাচ্ছি।'

মামা সুইচ অফ করলেন। শেষদিকে তাঁর স্বর শ্লেষ্মায় জড়িয়ে যাচ্ছিল। মামা তাঁর গাড়িটাকে পাঠাচ্ছেন ড্রাইভার সমেত। এরপর না গেলে হেনস্থার সম্ভাবনা ষোল আনা।

লেখক মামা আঠারো বছর আগে এই বড়সড় ফ্ল্যাটটি কেনেন। এর পিছনে বিলক্ষণ কিছু যুক্তি আছে। প্রথমত, নারায়ণপুর বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্গত এবং এয়ারপোর্ট প্রায় ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। দ্বিতীয়ত, এখানে সবুজ একেবারে ধূসর হয়ে যায়নি এবং রাত ঘনালে এলাকাটা মোটামুটি মটকা মেরে থকে অর্থাৎ দূষণের পরিমাণ মাত্রাছাড়া হয়নি। তবে বঞ্চনার অভিমানও রয়েছে। নাকের ডগায় নিউটাউনকে নিয়ে সরকারের যত আদিখ্যেতা, তার পাঁচ শতাংশও নারায়ণপুরের জন্য নয়। একগণ্ডা মসজিদ, মন্দিরের সংখ্যা মাত্র এক। জনসংখ্যা বাড়ছে মারাত্মক হারে। হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। দেড়যুগ আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েই মামা যেভাবে দুম্ করে ফ্ল্যাটটা কিনে নেন, তাতে স্বজন-পরিচিত সকলেরই ভ্রূকুঞ্চন ঘটে— ঋষিতুল্য মানুষটা আর একটা ভুল করে বসলেন। অতঃপর পাপীতাপীদের নিয়েই ঘুরপাক খাবে তাঁর যতেক ভাবনা। কিন্তু পছন্দটা তো মামার একার নয়। মামিও তো ঘাড় কাত করেন। তিনি কোনো হিরেজহরতের খোঁজ পেলেন? তবে এই ফ্ল্যাট কলকাতার অন্য সব ফ্ল্যাটকে টেক্কা দিতে পারে মজবুতিতে ও উচ্চতায়। জম্পেশ করে বুড়ো-বুড়ি এখানেই তাঁদের জীবনের শেষ পর্বটা শেষ করতে পারবেন। আত্মীয়রা কালেভদ্রে চড়াও হলেও ক্ষতি নেই। দারুণ বাজার। কাজের লোক নিয়েও ক্রাইসিস নেই। গৃহপ্রবেশের দিনে বহুবছর বাদে মামি মামাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। কন্যা ও জামাতাও খুশি। মামা যথেষ্ট মান্যতা পাচ্ছেন স্থানীয় চক্ষুষ্মান শিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন তো যেন হরিহরাত্মা।

স্থানটির আরও কিছু ব্যাপার লক্ষণীয়। মশক ও সারমেয়রাই যেন পুরসভার আদত পোষ্য। প্রায় প্রতিটি লোকের গায়ে রাজনীতির মোহর। হাওয়া বুঝে জার্সি বদলে ওস্তাদ। হয়তো সেই কারণেই বিগত জমানার কৌটাবাজি ও সিন্ডিকেটীয় জুলুমবাজি বর্তমানে আরও উদ্দীপ্ত ও ঊর্ধ্বগামী। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চমকপ্রদ। দলত্যাগ এবং মলত্যাগ এদের কাছে সমান। যানবাহনের মধ্যে প্রাধান্য পায় অটো ও টোটো। এদের পারস্পরিক হানাহানি নিত্যকার ঘটনা। এই সব নিয়েই স্থানীয় নেতাদের যা কিছু কোষ্ঠকাঠিন্য, শিরঃপীড়া ইত্যাদি উপসর্গ ও তাদের অপশম। এহেন পরিবেশের সঙ্গে লেখক মামা দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন। পারতপক্ষে কোনো নেতা-নেত্রীর বচন শুনতে যান না। এমনকী তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে স্থান পেয়েও এমন ভাব দেখান যেন কানে তুলো ও চোখে চালসে। অথচ স্থানীয় প্রতিটি লোকের সঙ্গে গলায় গলায় খাতির কোনো মতলব ছাড়াই।

এহেন মাতুলের নিবাসে অন্তত হপ্তাখানেক কাটিয়ে আসার মওকা। আঁখি কেবল রাজি নয়, অনুত্তম অনিচ্ছা প্রকাশ করলে এমন মন্তব্য করবে যে সি আই ডি সাহেবের কানটান গরম হয়ে উঠতে পারে।

মামার ড্রাইভার সুবলও চলে এসেছে লাল মারুতি নিয়ে। তবে গোরাবাজারে গাড়ি পার্ক করতে গেলে অনেক ঝানু চালকও যেন কাঁচিকলে পড়ে যায়।

পার্কিং প্লেস খুঁজতে সুবলকে চলে যেতে হয় রেলের লেভেল ক্রশিং অবধি। রেলের লোক গেটটাকে সাপটে ধরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলে, আহ্লাদের সঙ্গে বিড়ি বিনিময় করে নিশ্চিন্তে অনুত্তমদের দোরগোড়ায় এসে গেল সুবল।

দশ মিনিটের মধ্যে আঁখি ও অনুত্তম সুবলের গাড়িতে উঠে বসে। ফার্লং কয়েক যাবার মধ্যেই মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রীর দু-দুখানা অতিকায় কাটআউট। ফুটবল খেলার মাঠ থেকে আরম্ভ করে শ্মশানঘাট অবধি আত্মপ্রচারের এমন বাহারের হাত থেকে উদ্ধার মেলা দুষ্কর। তামিলনাড়ুতে গিয়েও অনুত্তম জয়ললিতার এবং লক্ষ্ণৌ গিয়ে মায়াবতীর এহেন চিত্রময় রগড় প্রত্যক্ষ করে এসেছে। সে সরকারি আমলা। তাই এসমস্ত প্রভাব খুব কম সময়ে মন থেকে মুছে ফেলতে সমর্থ।

তবে খুব খারাপ লাগে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পোস্টারগুলিতে ভুল বানানের ছড়াছড়ি দেখে। শোধনের প্রয়াসও নাস্তি।

এয়ারপোর্টের একনম্বর গেটকে ছুঁয়ে সুবল গাড়িকে নিয়ে এল কইখালির মোড়ে। সেখানে বিকট যানজট। এখানেও হেতু

সেই রাজনীতি। ভোট আগত। তাই কাল ব্রিগেডে হবে শাসক দলের মহাসমাবেশ। সেই উদ্দেশ্যে জোর প্রচার। পথে বেপথে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রচারমঞ্চ। পতাকা ও প্ল্যাকার্ডে ছয়লাপ। যেন এক ধরনের বর্ণবিভ্রাট।

সুবল কলকাতার রাস্তায় একজন দুঁদে গাড়িচালক। জটলা কাটিয়ে নারায়ণপুর ঢোকার পথে গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারল চারচাকাকে। কিন্তু অটো, রিক্সা, ভ্যানগাড়ি, সাইকেল, পুলকার এবং থেকে থেকে যাত্রাবোঝাই বেসরকারি বাস— এরা সকলেই একে অপরের ভয়ে তটস্থ। ড্রাইভাররা কটমট করে একজন আর একজনের দিকে তাকায়, দু-চার কলি কাঁচা খিস্তি উড়ে এসে যেন পারস্পরিক বশীকরণের কাজ করে।

পথের একধারে এয়ারপোর্ট অথরিটির দেওয়াল দৈর্ঘ্যে কমসে কম দু'কিলোমিটার। বাম জমানায় এই পথটা ছিল সহস্র দীর্ণ, কোথাও কোথাও যেন ধাপার আবর্জনা, দুর্গন্ধ। এখন সেই দুর্দশা প্রায় কাটিয়ে ওঠা গেছে। কিন্তু নারায়ণপুরে বটতলায় এত মানুষের ভিড় যেন একজন আর একজনের মাথা খায়। বয়স্কদেরও খাতির করে না। তার ওপর হেলমেটহীন ছোকরারা যেভাবে বাইক ছোটায়, তাতে ঘাপটি মেরে থাকা বিপদ যে কোনো মুহূর্তে লাফ দিতে পারে। ট্রাফিক নিয়ম মানবার বালাই নেই বললেই চলে। কোনোরকমে বিরাম নিতে নিতে অকুস্থল হাউসিংয়ের অভ্যন্তরে উদয় হলো সুবলের চারচাকা। কমপ্লেক্সের ভেতরটাতেও অনেক দুর্দশা। বিস্তর খোঁচাখুঁচির পরও জল নিষ্কাশনে অকথ্য পরিস্থিতি। মশা-মাছির অবাধ বংশ বিস্তার।

সোপার্দ করা অভিযুক্তের ভঙ্গিমা নিয়ে গাড়ি থেকে প্রথমে নামে অনুত্তম। তারপর আঁখি। মামা দাঁড়িয়েই ছিলেন। বললেন, 'আসতে নিশ্চয় বেশ ঝামেলা হয়েছে। টিভিতে দেখলাম, কলকাতার এখানে-ওখানে গাছ পড়ায় চলাচলে খুব ঝামেলা হচ্ছে।'

সুবল জানায়, 'এ এলাকায় তেমন কিছু ঘটেনি। তাছাড়া বৃষ্টিও ধীরে ধীরে ধরে আসছে।'

মামা বললেন, 'অত ভরসা করাটা অবিমৃশ্যকারিতা। সারা দুনিয়ায় আবহাওয়া বদলাচ্ছে। দায়ী আমরাই। প্রকৃতি কখন যে কোথায় মোক্ষম ঘা মারবে, মানুষ আর নির্ভুল ভাবে বলতে পারছে না।'

মামা অনুত্তম ও আঁখিকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন ঘরের দিকে।

এই হাউসিং কমপ্লেক্সের পরিস্থিতি কোনোকালেই রাজকীয় ছিল না। এখন তো নয়ই। তদুপরি কিছু আবাসিকের মানসিকতা

জঘন্য। তারা হাউসিং সোসাইটির মেইনটেন্যান্স বাবদ একটি টাকাও জমা দেন না। অথচ জল ও বিদ্যুৎ উপভোগ করেন। স্থানীয় পুরসভায় নালিশ করেও বিচার মেলেনি। কারণ, সকল পুরপিতা ও পুরমাতার বড় ভাবনা ভোট নিয়ে। ভোটের কথা ভাবতে ভাবতেই তাদের এক সময়ের নীতিসমৃদ্ধ ডনবৈঠক করা শরীর বর্তমানে নিছকই পেটরোগা, নড়বড়ে।

আঁখি এসেই হেঁশেলের দখল নিয়েছে। বড় বড় কাপে টইটম্বুর কফি বৃষ্টিবাদলের দিনে মেজাজকে তরতাজা করে। আলস্য, অভিমান, ভয়ডর সব উধাও। তিন জনেরই চোখে মুখে মেরুজ্যোতির প্রকাশ।

আঁখি ও অনুত্তমকে নিয়ে আসতে গাড়ি পাঠবার পরই বিবেচক মামা এক কাণ্ড করেছেন। নারায়ণপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত ও পেল্লাই রেস্তোঁরা 'হালুম-হালুম' থেকে রেওয়াজি খাসির মাংস নিয়ে এসেছেন টিফিন কেরিয়ার ঠেসে। সেই বস্তুর সৌরভে বাতাস ম-ম।

মামা সচরাচর টিভির সুইচ অন করেন না। খবর মানে কি কেবল বিজ্ঞাপনে টাসা সরকারি কেত্তন, খুন-খারাপি ও ধর্ষণ? আজ কিন্তু টিভির পর্দা থেকে দৃষ্টি সরাবার ফুরসত নেই। ইসলামি জঙ্গিদের মদতদাতা প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানকে ভারত সমেত তামাম দুনিয়া কী জবাবটা দিচ্ছে, তা দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে আবেগে উত্তেজনায় কপালে ঘাম জমে। মামা রুমাল বের করে কয়েকবার ওই ঘাম মুছলেন। চিনে মাটির বাটিতে সাজিয়ে গরম ঘুগনিও পরিবেশন করল আঁখি। টিভি দেখতে দেখতেই কেটে গেল ঘণ্টাখানেক। এরপর স্নানপর্ব। আঁখি দেখল, নীচের কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে একটা প্রজাপতি বেরিয়ে আসছে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায়। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনুত্তম অবাক হয়ে দেখল ও শুনল, মুনিশ গোছের একটা সাধারণ লোকও আকাশের দিকে দু-হাত তুলে স্লোগান দিচ্ছে, 'ভারতমাতা কী জয়!' গোটা দুনিয়াটাই যেন রাগে গরগর করছে।

যথারীতি খাবার টেবিলে পরিবেশনের দায়িত্বও আঁখিরই। বোলের ঢাকনা খুলতেই অপূর্ব রেওয়াজি ঘ্রাণ। স্বাদ নেবার পর সেই মুগ্ধতা পরিপূর্ণ হলো।

'দুর্দান্ত।'

— অনুত্তমের মন্তব্য।

মামা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হালুম হালুম'-এর রেওয়াজি মাংসের স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে পারতপক্ষে অন্য কোনো হোটেল বা রেস্তোরাঁয় ঢুঁ মারতে যাবে না।'

আঁখি হাসে, 'রেস্তোরাঁর নামটা কিন্তু ভারী অদ্ভুত। হালুম-হালুম।'

মামা বললেন, বিকেলের দিকে ওয়েদার যদি পারমিট করে আমি তোমাদের নিয়ে যাব ওই রেস্তোরাঁয়। ওরকম ঝকঝকে তকতকে রেস্টুরেন্ট ধারেকাছে দ্বিতীয়টি নেই। বৈচিত্র্য আছে, সুনাম আছে। বিক্রিবাটা ঈর্ষণীয়। নারায়ণপুরের বাইরের লোকেরাও এসে ভিড় করে চেয়ার দখল করতে।'

আরও দু'গ্রাস শেষ করার পর মামা জানালেন, 'হালুম হুলুমের মালিক সত্যনারায়ণ সরকার চমৎকার খোলামেলা স্বভাবের লোক। আমার প্রায় বন্ধুস্থানীয়। তবে সময় সময় কেমন যেন থম মেরে যান। কী কারণে যে তার মনে কু গায়, বলতে পারবো না। একটা হতে পারে, ওর কোনেও ছেলে বা মেয়ে নেই। আর সত্যনারায়ণের স্ত্রী কেবল শিক্ষিতা নয়, প্রায় ডানাকাটা পরি। ওদের বিয়ে নিয়ে নাকি বিস্তর জানাজানি কানাকানি হয়েছিল। দু'হাতে টাকা কামাচ্ছে। অথচ ভবিষ্যতের কেন্দ্রবিন্দুতে খুব অনিশ্চয়তা। আমি ওই দম্পত্তিকে নিয়ে কোনো এক সময় উপন্যাস নিশ্চয় লিখব।

দুর্যোগের দাপট ধীরে ধীরে কমে আসে। দামাল বাতাস ক্রমে নিরীহ গোবেচারি। সূর্য যখন পশ্চিম মুখে হাঁটা দিয়েছে, পড়তি বেলায় রোদ্দুর তখন আগাগোড়া মোলায়েম।

মামার গলায় খুশির আমেজ, 'তোমরা দুটিতে রেডি হয়ে যাও। আমি সত্যনারায়ণকে ফোন করে দিয়েছি। আজকের সন্ধ্যায় 'হালুম-হুলুম'-এর প্রধান খদ্দের হবো আমরা তিনজন। অনুত্তমের নামডাক যে হয়েছে আজ পরিচয়টা হবে।'

নারায়ণপুরে সকাল থেকে রাত অবধি কোলাহল। কোলাহলের অন্যতম উৎস রাজ্য রাজনীতি ও তজ্জনিত রকমারি সংবাদ ও রটনা। এই এলাকায় বরাবরই দলত্যাগের খুব হিড়িক। যখন যে দল ক্ষমতায় আসবে, তখন সেই দলের দিকে বেশিরভাগ ভাগ্যান্বেষী লম্ফ প্রদান করবেই। ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঠেকানো শিবের অসাধ্য। কাল আবার আগুয়ান ভোট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মহাসভা কলকাতার হৃদপিণ্ডে। এখান থেকে কোন গোষ্ঠী কত বেশি সংখ্যক অনুগামীদের নিয়ে ময়দানে হাজিরা দিতে পারবে, তা নিয়েও চলছে সেরা প্রতিযোগিতা। বেশ কয়েকটা পার্টি অফিস। ব্যস্ততার মধ্যেও সেখানে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে ও মেয়েদের মনে হচ্ছে যেন শোরুমের পুতুল। অধিকাংশ বাইক চালক ও আরোহীদের মাথায় হেলমেট নেই। গতির মত্ততায় গাঢ়ভাবে বুঁদ। মারতে অথবা মরতে যেন বদ্ধপরিকর। বেশিরভাগ দোকান খোলা হয় বেশ বেলায়। আর ঝাঁপ ফেলা রাত এগারোটার পর। বিস্তর হাই রাইজিং ফ্ল্যাট যেমন উঠছে, তেমনই অনেক আবাসনেরই পলেস্তরা খসা দশা পীড়াদায়ক। আঁখি ও অনুত্তম বুঝতে পারে, রাজনীতি নিরপেক্ষ লোক হয়েও তাদের লেখকমামা বেশ

লোকপ্রিয়। বারবার মাথা হেলিয়ে মুচকি হাসির আদান-প্রদান। অর্থাৎ দুঃসময়েও মামা বিপন্ন হননি। হবেনও না। এলাকায় বৃহৎ নৃশংসতা বর্বরতার নজির নেই বললেই চলে। হাঁটতে হাঁটতে বটতলা। মামা দাঁড়িয়ে পড়েন, আঙুল তুলে দেখালেন 'হালুম-হুলুম'কে। সত্যিই যথেষ্ট বড় ও জমজমাট রেস্টুরেন্ট। সবক'টা চেয়ারে বসে আছেন খদ্দেররা। শার্ট-ট্রাউজারে ফিটফাট তরুণরা যেমন আছেন, কাপড়চোপড় সামলে অতি বয়স্করাও বেমানান নন। মহিলাদের মধ্যে কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে কম-বেশি জড়সড়। ওরা যে এখানে ঢুকতে পেরেছেন এটাই বুঝি সাবাসি জানাবার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত। কর্মচারীরা সকলেই বিশেষ উর্দিধারী। ছোটাছুটি, দেখভাল, জিজ্ঞাসাবাদ— ব্যস্ততার বিরাম নেই। 'হালুম-হুলুমের' একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্বত্বাধিকারী বাবু সত্যনারায়ণ সরকার ওই যে একটি বড়সড় চেয়ারে দেহ স্থাপন করে সমানতালে নির্দেশ দিচ্ছেন, টাকা গুনে ড্রয়ারে রাখছেন, কম্পিউটারে বোতাম টিপছেন। তাঁর ধরনধারন মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়। কখনো সাদাসাপটা হুকুম, কখনো ভাষায় অলংকার বসিয়ে কোনো ছা-পোষা খদ্দেরকেই হাত ধরে টেনে অবলীলায় পাশে বসানো এবং একজন সর্বজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কিছু উপদেশামৃত বর্ষণ। কখনো কাতর হয়ে মিনারেল ওয়াটার গলায় ঢালে, কখনো কারোর দিকে উপেক্ষার দৃষ্টিও হানেন। সব মিলিয়ে হালুম-হুলুম-এর পরিস্থিতি পরিবেশকে তিনি স্বয়ং চুটিয়ে উপভোগ করছেন।

মামা যখন অনুত্তম ও আঁখিকে নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন, সত্যেনবাবু তখন পরপর তিনবার কম্পিউটারে বোতাম টিপলেন। তারপর মুখ তুলে মামাকে দেখেই যেন নাড়ীরটান অনুভব করেন। সটান উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরেন বান্ধবকে।

অনুত্তম ততক্ষণে জরিপ করে ফেলেছে এখানকার পরিবেশ এবং সত্যেন সরকারকে। ভদ্রলোকের বয়স বাহান্ন হতে পারে। আবার ছাপান্নও হতে পারে। পানপাতার মতো মুখ। সেখানে বলিরেখার সংখ্যা কম নয়। বিত্তবান হলেও শরীরে চর্বির একান্ত অভাব। হাড়প্রধান শরীরে দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ ফিটের চেয়ে ইঞ্চিখানেক বেশিই হবে। রং ফরসা, একমাথা চুলে কালোর রঙের বাহার। বাণিজ্যের সঞ্জীবনী মুহূর্তেও একজন প্রবীণ কর্মচারীকে নিজের আসনে বসিয়ে তিন অতিথিকে নিয়ে বাড়ির ভেতরের একটি সুসজ্জিত ঘরে ঢুকে পড়লেন সরকারবাবু। সেখানে তিনটে সোফা। অনুত্তম যেন ইচ্ছে করেই সরকারবাবুর পাশে বসে পড়ে। তাদের মুখোমুখি আঁখি ও মামা। পরিচয়পর্ব শেষ হয় চটপট। 'আপনাকে নিয়ে উনি যে কয়টি বই লিখেছেন, সব আমি পড়েছি। উন্মুখ হয়ে ছিলাম পরিচিত হতে। এখন কথা বলে মনে হচ্ছে আপনি ও আখিঁ দেবী আমার কাছে মোটেই অচেনা নন।'

অন্তরঙ্গ আলোচনা। ব্যক্তিগত অবস্থান নিয়েই জাবরকাটা। কিছুটা আবেগ— যেখানে ফ্যানটাসিরও উঁকিঝুঁকি। সত্যনারায়ণ সরকার আজ এই এলাকায় অন্যতম ধনী ব্যক্তি। রাধাগোবিন্দের মন্দির নির্মাণে মোটা অঙ্কের টাকা ডোনেট করেছেন। কিন্তু জীবনটা তাঁর সংগ্রামী। নাগরদোলার মতো উঠেছে-নেমেছে। বিস্তর রোদ-বৃষ্টি ঠেঙিয়ে আজ তিনি এখানে এসে পৌঁছেছেন।

সরকারবাবু বলছেন, 'এখানে যত বাড়ি দেখছেন, তাদের প্রতিটি বড় অনুষ্ঠানে খাবার পাঠাবার বরাত আমি পাই। বরাত আসে রাজারহাট, কইখালি ও নিউটাউন থেকেও। দোকানের পিছনে রয়েছে যে বড় বকুলগাছটা, ওকে আমি সমীহ করি। এক একসময় মনে হয় ও যতদিন আছে, আমিও ততদিন আছি।... চেহারা দেখে বুঝতে পারবেন না। আসলে বয়স আমার বাষট্টি পেরিয়েছে।'

কফি এলো। এগ রোল এলো। প্রকৃত সুস্বাদু। কথা অসমাপ্ত রেখে বাথরুম ঘুরে এলেন সরকার। টকাস করে রোলে কামড় দিয়ে আঁখি বলে ওঠে, 'বাঃ! দারুণ তো খেতে!'

এই সময়ই একজন কর্মচারী এসে খবর দেয়, 'থানা থেকে লোক এসেছে। খাবারের প্যাকটটা চাইছে।'

সরকারবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, 'দিয়ে দাও।'

কর্মচারী তৎক্ষণাৎ একরকম ছুটে পালায়।

'এই হয়েছে মুশকিল।' সরকারবাবু নীচু গলায় বললেন, 'পুলিশের কোনো বড় কর্তা থানায় এলে অথবা পথচলতি কোনো মন্ত্রী পার্টি অফিসে ঢুকে পড়লে ফোন আসবেই। অমুক খানা পাঠান। সব ফেলে রেখে ওই খানাই রেডি করতে হবে। দাম যে কী হবে, কবে পাবো স্থিরতা নেই। বেশি কিছু বলতে পারি না। আমার বউ তো আবার রাজনীতি করে।'

'তাই নাকি!' আঁখি চোখ কপালে তোলে, 'ওনার সঙ্গে যে এখনও পরিচয় হলো না!'

'একটু অপেক্ষা করুন। কী এক গোপন মিটিংয়ে গিয়েছে। এখুনি ফিরবে।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

মিনিট দশেকের মধ্যে কর্ত্রী এসে গেলেন। বয়স্ক ব্যবসায়ী সত্যনারায়ণ সরকারের স্ত্রী কেমন হতে পারেন, তা নিয়ে আঁখির

হয়তো একটা কল্পনা ছিল। সেই কল্পনা সম্ভবত বাস্তবের সঙ্গে মিলল না।

আরে, ইনি যে এক অতি আধুনিকা তরুণী। রূপের বিচারেও প্রথম সারিতেই বসবেন। ঘিঞ্জি নারায়ণপুরে তাঁর অবস্থান নির্ঘাত অসচরাচর। পরনে জিনসের প্যান্ট ও টাইট গেঞ্জি, চুলে কদমছাঁট। চোখে মিহি চশমা। গায়ের রং এমন রক্তাভ ধবল যে অ্যাংলোকে হার মানায়।

'নমস্কার, আপনাদের সকলকে নমস্কার।'

— ঋজু তনু ঈষৎ বক্র হয়। 'স্বর অতীব মোলায়েম। সরকারবাবু একটু হাসলেও তাতে খুশির ঝলক কম। বললেন, 'আমার স্ত্রী জিনিয়া সরকার। বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট হলেও গুণে বড়। রাজনীতিতে নেমেই যেভাবে নাম কিনেছেন, সামনের পুরভোটে কাউন্সিলর হবেই। তাতে অবশ্য আমার ব্যবসায়িক সুবিধা কিছু হবে। একটি দুঃখ আমাদের। কোনো উত্তরাধিকারী নেই।'

জিনিয়া সরকার আঁখির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ছিলাম না। সত্যি—'

অনুত্তম তাকে শেষ করতে দেয় না, দলের কাজ আগে। তাছাড়া সরকারবাবু যেভাবে আপ্যায়ন করলেন, অতুলনীয়।'

জিনিয়া মিষ্টি হেসে বসে পড়েন। বলেন, 'আপনার নাম কাগজে পড়েছি। আপনার মামাবাবুর উপন্যাসেও আপনিই নায়ক। অনেকদিনের ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবো। এতদিনে সেই ইচ্ছে পূর্ণ হলো।'

আর এক রাউন্ড কফি এলো। এবার সঙ্গে চিকেন পকোড়া। এটাও স্বাদে অসাধারণ।

জিনিয়া সরকার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোতলা বাড়ির প্রায় সবটাই দেখালেন আগন্তুকদের। তারপর সবিনয়ে বললেন, 'আবার আমাকে ঘণ্টাখানেকের জন্য বের হতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, সামনেই সাধারণ নির্বাচন। কাল ময়দানে বিরাট মিটিং। আমার একটা ভূমিকা রয়েছে। নারায়ণপুর থেকে যতজন সম্ভব মহিলাকে নিয়ে যাবো সভায়। পুরুষদের সংগঠিত করার দায়িত্ব তরুণ নেতা ফরিদ আহমেদের।

জিনিয়ার এই ঘোষণায় সরকারবাবুর মুখবিকৃতি লক্ষণীয়। চাহনিতে ফুটে ওঠে বিরক্তি, 'একসময় তুমি থাকতে বইখাতা নিয়ে। এখন এই পার্টিবাজি তোমাকে শুষে খাবে।'

জিনিয়া ঠোঁট ভাঙেন, 'থাক না। সেটা একেবারেই আমার ব্যাপার। আমার যাতে আনন্দ, সেখানেই আছে আদর্শ।'

সরকারবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'দুনিয়াটা আমি তোমার চেয়ে বেশি দেখেছি, জিনিয়া।'

'কাস্টমারদের পকেট হাল্কা করাটাই তোমার জীবনের ব্রত। আমি তো এ নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমাকে যেতেই হচ্ছে।'

জিনিয়া সরকার বেরিয়ে গেলেন। জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতিকে কিছুটা দেখা যায়। রাতের আকাশে ঘুরছে সাদা মেঘের ভেলা। সত্যনারায়ণাবাবুর তখনও তাঁর জমজমাট রেস্তোরাঁ নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি আবার একরকম জোর করেই বসালেন অতিথিদের। গৃহস্বামী প্রায় একতরফাই বলে চলেছেন। জোরালোভাবে খুলে দেখাচ্ছেন তাঁর সংগ্রামী জীবনের কাঠামোকে। বর্ণনায় যে খুব চৌখস, তা নয়। তবে একেবারে অকপট স্মৃতিচর্চা। চক্ষুদান পর্ব থেকে শুরু করে একেবারে শেষ অবধি। ঘটনার ঠেলাঠেলি। বোঝা যায়, ভেতরটা তার কী কারণে যেন ফুঁসছে। একমাত্র সাহিত্যিক মামাই গভীর আগ্রহে শুনছেন তার প্রতিটি কথাকে।

'...এই তো দেখলেন আমার সংসারের পরিধি। একটা সন্তান যদি থাকতো। আমি দত্তক নেব না। দু'জনের সংসারে কত রকমের যে ফ্যান্সি জিনিস। জিনিয়া যে মাসে কত টাকা ওড়ায়!... সংসার সামলায় একটা কাজের মাসি। রান্না থেকে আরম্ভ করে সব। এ বাড়িতেই থাকে। জিনিয়ার ন্যাওটা। ওর পিছনেই যে মাসে কত টাকা ঢালে আমার মিসেস!'

আঁখি হঠাৎ মন্তব্য করে, 'জিনিয়াদেবী ভাগ্যবতী। কুবেরের ঘরনি। উনি আপনার জীবনে এলেন কীভাবে, আপত্তি না থাকলে যদি...'।

মামা তখনই বলেন, 'আমি সব জানি। সব। আমার লেখার পাত্রপাত্রী।'

সরকারবাবু মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেন। পুনরায় ফিরে যান স্মৃতির সরণিতে। সত্যনারায়ণ এবং জিনিয়া দুজনেরই জন্ম পুরুলিয়ায়। পাশাপাশি দুটি গরিব পরিবার। কিন্তু বয়সের ব্যবধান, তা ধরুন প্রায় আঠারো বছর। সত্যনারায়ণ যখন পাড়ার ক্লাবে দাপিয়ে ফুটবল খেলছে, শিশু জিনিয়া তখন লাল পলাশের ওপর দিয়ে ছোটাছুটি করছে। সরকার ওকে কতবার কোলে তুলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে। ওই ছোট্ট বয়সি জিনিয়া তখন থেকেই যেন রূপসচেতন। আর আছে ঈর্ষাকাতরতা। উপহার লাভের প্রবণতা। সরকারের বাবা স্থানীয় এক দর্জির কাছে কাজ করতেন। অন্নজোটানো কঠিন। অথচ দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলে সকলের ছোট। এক দিদিকে পটিয়ে সেই যে কে একজন মরুভূমির দেশে উড়ান দিয়েছিল, তার হদিশ বের করার সাধ্যি বাপের হয়নি। আর এক দিদি থাকেন দক্ষিণের ভেলোরে। খ্রিস্টান হয়ে যাবার দৌলতে সি এম সিতে আয়ার কাজ করেন। স্বামী সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্কে জরির কাজ করেন। বহু বছর ধরে ফ্যামিলি গেটটুগেদার অনুষ্ঠিত হয়নি। সনাতন মাধ্যমিক পাশ করতে পেরেছে। মিশুকে স্বভাব। প্রচুর কথা

একনাগাড়ে বলে যেতে সক্ষম। কলেজে ঢোকার চেষ্টা চলছিল, আর তখনই মর্মান্তিক বিপর্যয়। স্থানীয় এক বহুতল বাড়িতে দামি পর্দা লাগাতে গিয়েছিলেন সত্যনারায়ণের বাবা। নেমে আসার সময় পা ফস্কে পড়ে যান অনেক নীচে। আর তাতেই মৃত্যু।

'আমার অবস্থা তখন বুঝতে পারছেন? কোনো কাজই তো জানি না। পোস্ট অফিসে বাবার কিছু টাকা ছিল। তার একটা অংশ ভাঙিয়ে পথের ধারে বসে শুরু করলাম চপ-বেগুনির ব্যবসা। মাও সাহায্য করেন। বেশ চলছিল। মাকে নিয়ে বেড়াবার শখ মেটাতে গেলাম পুরীতে। গৌড়ীয় মঠে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তিন দিনের বেশি থাকা হলো না। এক প্রভাবশালী পর্যটক এসে স্থানচ্যুত করলেন আমাদের। ফিরে এলাম। এসে দেখলাম, আমাদের তেলেভাজার সরকারি জায়গাটা অন্যের কবজায় চলে গেছে। দুটো মেয়ে ও একটা ছেলে ওখানেই শুরু করে দিয়েছে সেই তেলেভাজারই শিল্প। আমার সাধ্য নেই ওদের সরিয়ে দিতে। কারণ ওই ছোকরা লাল পার্টির ক্যাডার। আর মেয়েদুটি ওর গুণমুগ্ধ। যদি কিছু করতে যাই, ভিটেছাড়া হতে হবে।'

সত্যনারায়ণ সরকার আবার চোখ বন্ধ করলেন। অতীতকে টেনে আনছেন। চোখ খুললেন। শুরু হলো পুনরায় স্মৃতিচারণ, 'স্যার জানেন, আজ আজ দু-দুটো গাড়ি। ইচ্ছে হলে আরও দুটো কিনে গ্যারেজে ঢোকাতে পারি। একদিন ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় পাড়ি জমাবো বলে মাকে রাজি করিয়ে বসতবাড়িটাকে বেচে দিয়েছিলাম। মাকে নিয়ে চলে এলাম এই রাজধানীতে। আমার ইনটুইশন বলছিল, কলকাতায় যা ভাগ্য ফিরবে। কলকাতায় এসে ভাগ্য ও মেহনতকে পুঁজি করে অনেক পাঞ্জা কষেছি। যেবার কলকাতায় এলাম, ডিসেম্বরের শেষ। পুরুলিয়ার তুলনায় শীতের কামড় কম। একজনের পরামর্শ মেনে ঢুকে গেলাম নারায়ণপুরে। বৃহত্তর কলকাতার অংশ। একদিকে এয়ারপোর্ট, অন্যদিকে রাজারহাট। তখনও নিউটাউনি গড়ে ওঠেনি। থিক থিক করছে লোক। বেশিরভাগই ধর্মে মুসলমান। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে লাগাম নেই। কয়েকটা মসজিদ। আজানের রবে বাতাস কাঁপে। আমার পুঁজি তো ঘড়াখানেক মোহর নয়। যা টাকা ছিল, তাতেই জলের দরে দেড়কাঠা জমি। সেখানেই টালির বাড়ি। শুরু করেছিলাম দশকর্মা ভাণ্ডার দিয়ে। চলল না। হিন্দুদের সংখ্যা যে তখন কম। মুকুন্দ দে নামে বাম দলের এক নেতা ছিলেন। এখন তিনি

দলত্যাগ করে নীল দলে আছেন। তাঁরই গোঁফের তলায় মুচকি হাসি দেখেছিলাম আমি। কাছে ডেকে ঘাড়ে হাত রেখে পরামর্শ দিলেন, 'এখানে দশকর্মার বাজার নেই। রেস্তোরাঁ কিংবা গোলদারির ব্যবসা যদি ফেঁদে বসতে পারো, আঙুল ফুলে কলাগাছ হলেও হতে পারে।'

সরকারবাবুর পুনরায় ক্ষান্তি দান। শ্রোতারা কেউই মুখ না খোলায় তিনি আবার শুরু করলেন, 'হয়ে গেলাম মুদি দোকানদার। ওইসময়ই একদিন রাজারহাট থেকে ভ্যানে চাপিয়ে মাল নিয়ে আসার পথে দেখতে পেলাম সেই জিনিয়াকে। সদ্য যুবতীর রূপে। সত্যি আমি শিহরিত। খুব সন্তর্পণে ওর সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করি। তবে জিনিয়াও খুব চালাক। বুঝেশুনে তবেই গণ্ডী পার হবে। ততদিনে বুঝে গিয়েছি, নারায়ণপুরে কী ধরনের কারবারে মুনাফার সম্ভাবনা অধিক। এখানে বাতাসে যেমন সর্বক্ষণ রাজনীতি, তেমনি জিভের চাহিদাও হেথায় বেশ রসালো। অতএব, অচিরে মুদিদোকান রূপান্তরিত হলো 'হালুম-হুলুম'-এ। খুব কম দিনে নাম কিনল আমার রোস্তোঁরা। এত টাকা উপার্জন হতে থাকে, যা ছিল আমার কল্পনাতীত। বেদনা একটাই— মা আমার এই বাড়বাড়ন্ত দেখে যেতে পারেননি। মা চলে গেলেন। আর এসে গেল আর এক জন। স্বয়ং জিনিয়াস জিনিয়া দেবী। আগে দেখা হলে ফিসফিসিয়ে কথা বলত, এবার লিখে ফেলল একখানা তিনপাতার প্রেমপত্র। কী করি বলুন তো? বয়সে অনেক ছোট, রূপে ডানাকাটা পরি, তদুপরি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। তবুও নিজেকে সামলাতে পারিনি। সাত পাকে বাঁধা পড়ে গেলাম।'

মামা সশব্দে হেসে ওঠেন, 'আপনার বিয়েতে জনা কয়েক মন্ত্রী ও বাঘা আমলা এসেছিলেন। আমি সাক্ষী।'

আঁখি বলল, মিসেস সরকার সম্পর্কে কিছু বলুন। তারপর আমরা আজকের মতো উঠব।'

'জিনিয়া আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আমি তার স্বামী। হিন্দু পরিবারে এ সম্পর্ক চিরায়ত। আমার যা কিছু সবই তো ওর। তবে বড্ড খরুচে। আর আমি কোনোদিনই মুক্তকচ্ছ হতে রাজি নই। তার উপর আবার শাসক দলের নেত্রী হবার স্বপ্ন দেখে। আমি আবার ওইসব দলাদলিতে নেই। আদর্শ কোথায়? নিজেরে মধ্যেই স্বার্থের গুঁতোগুঁতি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট। কী দরকার একজন গৃহবধূর এর মধ্যে ঢুকে নায়িকার রোল প্লে করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া? এই নিয়ে বচসা প্রথমে খানিক হবার পর একটা রফায় এসে গেলাম। আমরা কেউ কারোর ব্যাপারে নাক গলাবো না। আর জিনিয়া মাসে সাত হাজার টাকার বেশি হাতখরচা পাবে না।'

আঁখি মুখ টিপে হাসে, 'ওটাকে বাড়িয়ে দশ হাজার করুন।'

সরকারবাবুর জবাব, 'আবেদন করুক। বিবেচনা করে দেখব।'

অনুত্তমের স্থির দৃষ্টি সত্যনারায়ণবাবুর মুখের ওপর। সচরাচর একজন সফল ও ঝানু ব্যবসায়ীর মুখ থেকে এরকম অকপট আত্মবিশ্লেষণ শোনা যায় না। এরকম মানুষের সংখ্যা কমে আসছে।

'হালুম-হুলুম'-এর গদিতে ফিরে গিয়ে বসেছেন সত্যনারায়ণ সরকার।

আর এরা প্রত্যক্ষ করছে, সন্ধ্যায় নারায়ণপুরের বটতলাকে মানুষ ও যানবাহন কতটা জটিল করে তুলতে পারে। রিকশা, অটো, টোটো, বাইক, ভ্যানগাড়ি, ট্যাক্সি, পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর অন্তর বাস এবং শত শত মানুষের ব্যস্ততা... প্রতিমুহূর্তে ছোট বড় সংঘর্ষের আশঙ্কা। ভিড়ভাট্টা এড়াতে অভিজ্ঞ মামা অনুত্তম ও আঁখিকে একটি গলিপথ ধরলেন। গলির পরিবেশটা যে সহনীয়, ভাবা ভুল। তবে ভিড়ের চাপ কম। ভেতর দিকে যত পরিবার, প্রায় সবই সংখ্যালঘুদের। রিয়্যালিটি এই যে, ইত্যাকার এলাকাগুলিতে সমাজবিরোধীদের সংখ্যা ও তৎপরতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গলির এই মুখটা শেষ হতেই সন্ধান মিলল একটি সবুজ ভূখণ্ডের। অদূরে একটা বাঁধানো পুকুরও রয়েছে। বোঝা গেল, এই মাঠে খেলাধুলা হয়। তবে এই মুহূর্তে এখানে কোনো বালক বা তরুণের দেখা মিলল না। পরিবর্তে নজর কাটে এক দীঘদেহী এক বৃদ্ধ। মাথায় ফেজ টুপি, পরনে লুঙ্গি। বড় বড় পা ফেলে বিড়বিড় করতে করতে কোনদিকে চলেছেন, জানা নেই। মামা বললেন, 'এই জায়গাটার একটা অলুক্ষণে ব্যাপার হলো, কোথা থেকে যেন কিছু অজানা লোকের আমদানি ঘটে। আবার তারা কোথায় যেন হারিয়েও যায়। সত্যনারায়ণবাবুও এই কথাটা বলেছিলেন।'

আরও খানিকটা পথ পাড়ি দেবার পর মামা সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন। আঙুল তুলে দেখালেন, পূব দিকে একটা বড় একতলা বাড়িকে। বললেন, 'ওই যে বাড়িটা, ওটাই হলো ফরিদ আহমেদের বাড়ি। সিন্ডিকেটের পাণ্ডা। আবার পার্টিরও একরোখা পতাকাবাহী। সরকারবাবুর কাছে তো শুনলে। কালকের পার্টির মিটিংয়ে পুরুষদের নিয়ে যাবে ফরিদ। আর মেয়েদের নিয়ে যাবে জিনিয়া। ওপর থেকে সব ঠিক করে

দেওয়া হয়।

একবার ছাপ পড়ে গেলে নিস্তার নেই। সকলের অলক্ষে এই দেশের গণতন্ত্র ধীরে ধীরে যেন কুঁকড়ে পড়ছে।'

মামা যখন এই কথাগুলি বলছেন, তখনই পুবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন জিনিয়া সরকার। তাঁর পাশে এক সুবেশ বলিষ্ঠ তরুণ। মামা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ফরিদ আহমেদ। কার মনের পটে কী আঁকা থাকে সবটাই অনুমানের বিষয়। তবে কিসের এত সখ্য? আমি পুরনো মানুষ। মন বড় কু গায়।'

ওদের সামনাসামনি হতে হলো না। ওই দু'জনে ততক্ষণে হাত ধরাধরি করে চলেছে ভিন্ন মুখে। প্রতিটি মুহূর্ত তাদের কাছে হয়তো বিন্দাস।

মাঝে মাঝে দমকা বাতাস। বাতাসে কান্নার আওয়াজ। কাকে যেন কবরখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দাফনের উদ্দেশ্যে। একটা পুলিশের গাড়ি ছুটে গেল। তারপর আরও একটা।

মামা বিড়বিড় করে কী যে বললেন, শোনা গেল না।

কী যেন এক নীল রশ্মি এসে নামছে তাঁর ওপর।

রাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের আলোচনা। সাহিত্য-সিনেমা থেকে শুরু করে পাকিস্তানের জঙ্গি মদত। ভারতীয় বিমানহানায় কতজন জঙ্গি নিকেশ হলো, তা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কূটকাচালির প্রসঙ্গ উঠতেই শান্ত মাতুল নিতান্ত এক রাগী মানুষে পরিণত হলেন। তিনবার জোরে টেবিলে কিল মারলেন ফুর্তিবাজ মানুষটাই। আলোচনার ওখানেই ইতি। যে যার পায়ের ওপর ভর দিয়ে শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হয়।

বেশি রাতে শুয়েছিল তারা। ঘুম যখন ভাঙল, চরাচর তখন রৌদ্র কবলিত। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে একটা কোকিলেরই নাটুকে গলা।

আঁখি মুখ ধুয়েই ঢুকে পড়ে রান্না ঘরে। প্রতিটি বাসন সেখানে ঝকঝকে। নোংরা কিছু দেখলেই মামিমা কাজের মেয়েকে সাধারণত এমন ভাষায় ধমক দেন, যার কিছু অংশকে অশ্রাব্য মনে হতে পারে। আঁখি অবশ্য মেয়েটির সঙ্গে কথা বলল অন্তরঙ্গ সুরে। এমনকী ওকে এক কাপ চা করেও খাওয়ান। অনুত্তম জানে, আঁখি কোনোদিনই কেবলমাত্র সাংসারিক কূপমণ্ডুকতায় আবদ্ধা নয়। অত্যন্ত সামাজিক। সমাজের নিম্নতলবাসীদের আর্তনাদ সহজেই শুনতে পায়।

চায়ের টেবিলে বসে অনুত্তম মন্তব্য করে, 'মামিকে খুব মিস করছি।'

মামা বললেন, 'এই বয়সেও ওর কেন যে তে ব্যস্ততা!'

দূর থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ এই সময় কানে আসে। নিশ্চয় পার্টির মিটিঙে লোক জোগাড়ের প্রয়াস ডালাপালা মেলতে শুরু করেছে। মনে আসছে কাল সরকারবাবু কীভাবে তার বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। খুব একটা খুঁটিনাটি বর্ণনায় না গেলেও অনুত্তম ও আঁখির বুঝতে অসুবিধা হয়নি, জিনিয়া সরকারের রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাঁর কতটা অপছন্দের বিষয়। কী যেন একটা কলুষের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলেন ভদ্রলোক।

বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে মোট চারটি দৈনিক খবরের কাগজ এই বাড়িতে ঢোকে। চারটি কাগজেরই শিরোবার্তা, 'মতুয়া মহাসঙ্ঘের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া জননী বীণাপাণি দেবীর অমৃতলোক যাত্রা।'

মামা তাঁর দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'মতুয়াদের যাঁরা সত্যিকারের ক্ষতি করেছেন, তারাই এই দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। মা নিশ্চয় সেটা মনে রেখেছিলেন।

ঘড়ির কাঁটা ঘোরেচ এই মুহূর্তে সময় সকাল আটটা। মামার মোবাইলও ডাক ছাড়ে। ফোনটা তুলতে মামা একটু দেরি করলেন। অনুত্তম খেয়াল করে, আগত বার্তা মামাকে প্রথমে যেন স্তম্ভিত করে দেয়, তারপর তিনি কেঁপেও ওঠেন, '... সত্যনারায়ণ সরকার খুন হয়েছেন। ... দোকানের মধ্যে!... পিস্তলের গুলি! আমি আসছি, এখুনি আসছি ভাগ্নেকে নিয়ে।'

'কী হয়েছে, মামা?'

— আঁখি ও অনুত্তমের একই প্রশ্ন। মামা কিছুক্ষণ নিরুত্তর। যেন উন্মাদের শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ বোবা ফোনটার ওপর। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কাল আমরা হালুম-হুলুম-এর মালিকের সঙ্গে কত গল্প করে এলাম। আর এইমাত্র তার কর্মচারী সদানন্দ জানালে, দোকানের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে সরকারবাবুর গুলিবিদ্ধ প্রাণশূন্য দেহ। বিশ্বাস করতে পারছি না। আঁখি মা, তুমি বাড়িতেই থাকো। আমি ভাগ্নেকে নিয়ে এখুনি বের হচ্ছি।'

ভাড়া করা টোটো থেকে নামলেন মামা অনুত্তমকে নিয়ে। দেখলেন, রেস্তোরাঁর ঝাঁপ তখনও তোলা হয়নি। কিন্তু এক গণ্ডা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলী জনতা পুলিশের উপস্থিতি দেখে সরে গিয়েছে নজরের বাইরে। অনুত্তমের দৃষ্টি হঠাৎই আটকে যায় অদূরে একটি মিষ্টির দোকানের মাথায় লটকে থাকা বিজ্ঞাপনে। কন্ডোমের প্রচার। ছবিটা কিন্তু পর্নোগ্রাফির চেয়েও অশ্লীল।

রেস্তোরাঁর পাঁচ কর্মচারীই উপস্থিত। সকলের মুখে চোখে

আতঙ্ক। সত্যনারায়ণ সরকারের মতো নির্বিরোধ ভদ্র মানুষও খুন হতে পারেন! এইরকম ঘটনা যারা ঘটায়, তারা কোন মন্ত্রের ফসল?

কর্মচারীদের মধ্যে সিনিয়রমোস্ট সদানন্দ দাস পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। সদানন্দের বাঁ দিকটা অংশত অচল পক্ষাঘাতহেতু, কিন্তু ডান দিকটা এতই সচল যে যে কোনো আনকোরা কাজও চটপট করে ফেলে নিয়োগকর্তাকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম। সেই ফোন করেছিল মামাকে। আবার সোশ্যাল মিডিয়ার লোকেরা এসে তাকেই পাকড়ায়। একজন্যর পর একজন। প্রশ্নে প্রশ্নে ফালাফালা কে। কারণ গৃহকর্ত্রী নাকি সাতসকালে চলে গিয়েছেন ময়দানে নারী ও শিশুদের বাহিনী নিয়ে। জমায়েতের ফাঁক পূরণে আপন দক্ষতা দেখিয়ে নজর কাড়তে চান হাইকমান্ডের। তিনি কী আদৌ জানেন, তাঁর স্বামী খুন হয়েছেন? সদানন্দ চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু জিনিয়াদেবীর ফোনের সুইস যে অফ। স্থানীয় থানার যে আধিকারিক এসেছেন, অনুত্তমকে তিনি বিলক্ষণ চেনেন। অনুত্তমকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বিখ্যাত সি আই ডি অফিসার অনুত্তম চৌধুরী! কত জটিল কেসের মীমাংসা করেছে, আর উত্তাল গণস্তুতিতে তৃপ্ত হয়েছেন সরকার বাহাদুর।

অনুত্তমও চিনতে পারে। সুকান্ত বাগচি। বয়সে তরুণ, তবে যথেষ্ট দক্ষ। একেই বলে সোনায় সোহাগা।

'স্যার, আপনি! কী সৌভাগ্য!'

'আমি কাল এখানে এসেছি মামার বাড়িতে। কালই তো সন্ধ্যা থেকে বেশ রাত অবধি আমি, আমার স্ত্রী এবং মামা রেস্তোরাঁরার মালিক সত্যনারায়ণ সরকারের সঙ্গে সাতকাহন গল্প করে গেলাম। আর আজ শুনছি তিনি খুন হয়েছেন।'

'আমি নারায়ণপুর থানার চার্জে এসেছি মাত্র মাস তিনেক আগে। এখানে অপরাধজনিত কিছু বিপদসংকেত পেয়ে থাকি। রাজনৈতিক লোফারদের লোফালুফিটা খুবই চলে। কিন্তু মারদাঙ্গা, খুন-খারাপির রেকর্ড প্রায় পরিষ্কার। আপনাকে দেখতে পেয়ে মনে হলো অথৈ জল থেকে ডাঙায় উঠে পড়তে পারব।'

বাগচির কাঁধে হাত রেখে অকুস্থলে দিকে পা বাড়ায় অনুত্তম।

সত্যনারায়ণ সরকারের গুলিবিদ্ধ নিথর শরীরটাকে পাওয়া গেছে ঝাঁপবন্ধ হালুম-হুলুম-এর মধ্যেই। ল্যাপটপ সমেত ক্যাশের টেবিলটা ধরে রেখেছে তাঁর হালকা শরীরের একাংশকে। বাকিটা মেঝেতে লটকে আছে। দেখলে বোঝা যায়, তিনি খুনির সঙ্গে যুঝবার ফুরসতও পাননি। এখনও নামছে রক্তের ধারা। শীর্ণ শরীর থেকে অত রক্তের প্রবাহ প্রায় অভাবনীয়। বোতলকে একরকম মুখে ঢুকিয়ে আকণ্ঠ জলপান করে অনুত্তম। তারপর সুকান্ত বাগচির হয়ে নিজের কিছু ক্যারিশমা দেখাবার সূচনা। আনঅফিসিয়াল হলেও সে যা বলছে, পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাকে কার্যকরী করছে। আর মামার পর্যবেক্ষণী শক্তি ততই হয়ে উঠছে ক্ষুরধার। মৃত সত্যনারায়ণ সরকারের দেহ প্রথম দেখতে পান কে?

তিনি সেই মুখ্য হালুইকর সদানন্দ দাস

মুখ-মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সদানন্দ যে বিবরণ পেশ করল, তার নিগিলিতার্থ এই রকম—

প্রতিদিনের মতো আজও সকাল সোয়া সাতটায় হালুম-হুলুম-এর সামনে এসে সদানন্দ খানিক অবাক, মালিক এখনও দোকানের ঝাঁপ তোলেননি কেন? অথচ কাল কানাঘুষোয় জানা গিয়েছিল, আজ আধঘণ্টা আগেই শাটার তুলবেন সরকারবাবু। কারণ, এই সময় তিনি দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই দেখবেন, কীভাবে তাঁর স্ত্রী জিনিয়াদেবী পাড়ার মেয়ে-বউ-শিশুদের একরকম মার্চ করিয়ে নিয়ে চলেছেন পার্টির পতাকা ওড়ানো বাসের মধ্যে ঠেসে ঠেসে তুলতে।

সরকারবাবু এই পার্টি ত্রিসীমার মধ্যে না থাকলেও নিজের স্ত্রীর এমত তৎপরতা দেখার একটা আগ্রহ নিশ্চয়ই ছিল।

তাই হালুম-হুলুম-কে শাটারবদ্ধ দেখে সদানন্দ থমকে দাঁড়িয়ে ছিল এক দেড় মিনিট। সবে একটা বিড়ি ধরিয়েছে, এমন সময় তার ছোট মোবাইলটা বেজে ওঠে।

খোদ ম্যাডামের গলা।

'সদানন্দ, তোমার বাবু কী দোকান খুলে বসেছেন? ফোনে পাচ্ছি না কেন ওকে? ফোনটা বেজেই চলেছে!'

'শাটার তো তোলাই হয়নি।'

'বারে! একবার ডেকে দাও তোমার বাবুকে।'

সদানন্দ তখন বাড়ির প্রবেশপথে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই কপাট যথারীতি বন্ধ। তিনবার কলিংবেল টিপবার পর দোতলা থেকে থপথপিয়ে নেমে এসে দরজা খুলে দিল রমা মাসি। সরকার পরিবারের কেবল রাঁধুনি নয়, সে যেন এই বাড়িরই একজন সদস্যা। অন্যতম সদস্যা।

লেখক মামা তাঁর প্রকাশিতব্য রহস্য উপন্যাসটিতে রমা মাসির যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটাই এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

রমা মাসির পুরো নাম রমা বণিক। বিধবা এই মহিলাকে

জোগাড় করবার কৃতিত্ব মিসেস জিনিয়া সরকারের। যাচ্ছেতাই রকমের স্থূলাঙ্গী। একতলা থেকে দোতলায় উঠতে অথবা দোতলা থেকে একতলায় নামতে তাঁর খুব কষ্ট। তবুও ধনী সরকার পরিবারে রান্নাবান্নার সঙ্গে এই কাজটাও নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে বছর পাঁচেক ধরে।

সেই মাসি হাঁপাতে হাঁপাতে সদানন্দকে জানাল, সকাল থেকেই এ বাড়িতে এত তোলপাড়, এতবার দরজা খোলা ও দরজা বন্ধ চলছে যে তার আর শক্তিতে কুলোচ্ছে না। এবার সে অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নেবে। মাসি বলছে বটে, কিন্তু তার দু'চোখে কেমন বুঝি ব্ল্যাঙ্কলুক।

সদানন্দ বাড়ির ভেতর দিয়ে ঢুকল রেস্তোরাঁর অভ্যন্তরে। এবং প্রত্যক্ষ করল ওই দৃশ্য। চিৎকার করে বাইরে বেরিয়ে আসে। ম্যাডামকে ফোনে জানাবার কথা আর স্মরণে থাকে না। লোক জড়ো হয়। থানায় খবর যায়। মামাও ফোন পেলেন। কিন্তু আর ফোনে পাওয়া গেল না জিনিয়া সরকারকে। তিনি তো ময়দানে। নির্ঘাত ভাষণ শুনছেন, হাততালি দিচ্ছেন।..

পুলিশের গাড়ি আসতেই ভিড় পাতলা। এতে অনুত্তমেরও কাজের সুবিধা। পাঁচজন কর্মচারীই উপস্থিত। সদানন্দ, নির্মল, অসীম, বিশ্বরূপ, সুধীন্দ্র ও গৌতম।

সদানন্দকে জেরা করার পর্ব শেষ। বাইরে শাটার যেমন বন্ধ ছিল, বন্ধই থাকল। রেস্তোঁরার ভেতরের সবক'টা আলো জ্বালিয়ে চলছে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ পর্যবেক্ষণ। গভীর থেকে আরও গভীরে ডুব দিচ্ছে অনুত্তম চৌধুরী। একটা জনপ্রিয় রেস্তোঁরার সকল বৈশিষ্ট্যকেও কবজায় আনতে সে যেন বদ্ধপরিকর। যে সমস্ত ভোজনরসিক লোকলস্কররা এখানে ঢুকে এই মাগ্গিগণ্ডার বাজারেও পকেট খালি করে যায়, সেইসব অবতারদের ঘ্রাণও পাচ্ছে হয়তো অনুত্তম। যত রকমের রান্নার বস্তু নিয়ে বড় বড় কাগজের প্যাকেটে তাদের ঢুকিয়ে লাল হরফে লেখা রয়েছে। মোমো, স্ন্যাক্স অ্যান্ড আদারস, স্যুপ, চাইনিস ভেজ, তন্দুর অ্যান্ড কাকাব, ফ্রায়েড রাইস, নুডুলস, চাইনিস নন ভেজ, ইন্ডিয়ান ভেজ, এক, ফিস, চিকেন, মাটন,

ডিফারেন্ট ড্রিঙ্কস..। কেবল অনুত্তম চৌধুরী কেন, তার সাতকুলেও প্রকৃত ভোজনরসিক বলতে কেউ নেই। তবুও তার মনে হলো, সে এমন একটা নির্জন দ্বীপে ঢুকে পড়েছে যেখানে কেবলমাত্র পেটুকরাই আপন আপন হৃদয়েশ্বরীকে নিয়ে আসে এবং ভোজনান্তে গাঢ় তৃপ্তি সরকারে ফিরে যায়। ব্যাগ বস্তা ঠোঙা ইত্যাদি সরাতে সরাতে অনুত্তম আবিষ্কার করল একটা কাঠের পাটাতন বসানো মইকে। রুদ্ধস্বরে অনুত্তম নিজেকেই প্রশ্ন করে, 'এটাকে ঢেকে রাখবার কী অর্থ?'

বলেই সুকান্ত বাগচির মুখের দিকে তাকায়, 'মই কেন আছে এ ঘরে?'

সুকান্ত বললেন, 'দরকার হয় নিশ্চয়।'

'লক্ষ্য করে দেখ, দুটো গুলির একটা চূর্ণ করেছে সরকারবাবুর খুলিকে। অন্যটা বিদ্ধ তাঁর ঘাড়ে। অর্থাৎ খুনি কোনো একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলি করেছিল।'

'ঠিক এবং উঁচু প্ল্যাটফর্মটার ভূমিকার পালন করেছে এই লুকিয়ে থাকা ল্যাডারটা।'

অনুত্তম বলল, 'মইটা অবশ্য এই ঘরেই হয়তো রাখা থাকত। পেরেক ঠোকাঠুকি, মাল ওঠানো নামানো ইত্যাদির কাজে ব্যবহৃত হতো। আর যে খুনি, সে এই মইটার হদিশ রাখত। কেবল তাই নয়, সে সরকারবাবুর নিশ্চয় বিশেষ পরিচিত। সে কারণেই খুনি যখন মইয়ের দু-ধাপ কী তিন ধাপ উপরে উঠছে, সরকারবাবু তখনও আক্রান্ত হবার আশঙ্কা করেননি। উঁচু থেকে বুলেট ছুটে এলো। সরকারবাবু প্রাণ হারালেন। তারপরও খুনি স্থান ত্যাগ করেনি। মইটাকে বস্তা দিয়ে ঢেকে রেখেছে তদন্তকারীকে বিভ্রান্ত করতে। তিনটি সত্যকে দেখতে পাচ্ছি। প্রথম, খুনি সরকারবাবুর বিশেষ পরিচিত। দ্বিতীয়ত, খুনির একার পক্ষে অতটা কাজ করা সম্ভব ছিল না, তাকে সাহায্য করার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি মজুদ ছিল। তৃতীয়ত, গুলি চলল, অথচ শব্দ কেউ শুনল না, এটাই বা কেমন? হয়তো তখন অন্য কোনো কলরব প্রকট হয়ে ছিল এই ঘরে অথবা বাইরে।'

সুকান্ত বাগচি বললেন, 'এই এলাকায় সাতটা বাজবার আগে থেকেই শোরগোল চলছিল আজ। ময়দানে নিয়ে যাবার জন্য লোক টানাটানি।'

এরপর অনুত্তম যা করল, তাতে সুকান্ত বাগচিও হকচকিয়ে যান, যেহেতু এই কাজটা তাঁরই করা উচিত ছিল। যেন বিদ্যুৎ গতিতে দেয়ালে ঠেকিয়ে মইটার ওপর পা রেখে রেখে উঁচুতে উঠে যায় এবং প্রশস্ত ঘুলঘুলির মধ্যে রুমাল সমেত হাত ঢুকিয়ে বের করে আনে ছয় গড়ার একটি পিস্তল— যার আঁতুড়ঘর খোদ চীনে। সুকান্তর হাতে ওটাকে সাবধানে তুলে দিতে দিতে অনুত্তম বলে, 'সাবধান। আঙুলের ছাপ পেলেও পেতে পারো।'

অতঃপর দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাপর্ব। যাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তাঁরা কেউই শাঁসালো নয়। আপাতভাবে মনে হবে, এরা কেউই খুনের সঙ্গে জড়িত হবার যোগ্য নয়। তবুও রেহাই নেই।

সদানন্দর পালা সাঙ্গ হয়েছে আগেই। এবার সেই পৃথুলা রমা মাসির পর্ব। বুড়ি রীতিমতো কাঁপছে। সংলাপ চালিয়ে যাবার মতো সামর্থ্য আছে কিনা সন্দেহ। এমন অস্থিরতা যেন তার কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সুকান্ত বাগচি তাকে জল খাওয়ালেন। তারপর শোনা গেল রমা মাসির গলা, 'আমাকে আবার কেন? আমাকে—'

অনুত্তম আচমকা দাবড়ে ওঠে, 'আপনিই তো সব জানেন। ওসব ন্যাকামি ছাড়ুন। সোজা হাজতে ঢুকিয়ে দেবো।'

রমা মাসির দু'চোখে নিশুতি রাতে ভূত দেখার আতঙ্ক, 'হাজত!'

'হ্যাঁ, হাজত। উঠতে বসতে রুলের গুঁতো।'

'না, না, বাপ আমার! না, না। যা জানি, সব কইবো। কিচ্ছুটি লুকোবো না।'

'আগে এই চেয়ারটাতে বসুন।'

রমা মাসি ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে।

অনুত্তম : রাতে ভালো ঘুম হয় আপনার?

মাসি : ঘুম আসতে চায় না। আসলেও কেমন যেন ছানাকাটা, ছানাকাটা। একটা ইঁদুর, কী একটা প্রজাপতিও ঘরে ঢুকলেও টের পাই।

অনুত্তম : বাঃ। এই তো বেশ গুছিয়ে বলতে পারছেন। তা আপনার এই যে ঘুমের অসুবিধা, এটা কখনো বাবু বা তার বউকে জানিয়েছেন?

রমা মাসি কিছুক্ষণ নিরুত্তর। নিজের বুককে কাপড় দিয়ে আরও খানিকটা আবৃত করে। এমন তার অভিব্যক্তি, যেন যথাযথ শব্দের অন্বেষণে আছে সে। ক্রমে শোনা গেল তার অভিমানী কণ্ঠস্বর, 'ওদের কী তা শোনার মতো মন আছে? নাই। এই ভূখণ্ডে আমার আপন বলতে কে? কেউ নয়।'

মাসি দম নেয়। অনুত্তম যুগপৎ বিস্মিত ও উল্লসিত। রমা মাসি তো সাধারণ নয়। ভাষার ওপরও দারুণ দখল। 'ভূখণ্ড'— এই শব্দটাই যেন অনুত্তমের কর্ণকুহরে মুহূর্ত কয়েক নৃত্যরত অবস্থায় থাকে। অনুত্তম শুনছে মাসির পরবর্তী কথাগুলি— 'ওরা নিজেদের মধ্যেই এটা-সেটা নিয়ে যা খিচ্ খিচ্ করত, আমার তো গায়ে কাঁটা দিত। আচ্ছা, এ এলাকায় কোনো বাড়িতে এত টাকা ঢোকে রোজ? তবু বাবু মামণিকে গুনে গুনে টাকা দেন, হিসেবও নেন। আগে কিন্তু এমনটি ছিল না। সেইসব দিনে কত ভাব আমি তাঁদের দেখেছি। সত্যি বলছি বাবু,

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাব ভালোবাসা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। যে কোনো অছিলায় ঝগড়া খিস্তি-খামারি। কাল ল্যাপটপের একটা ব্যাগ নিয়ে কী কথা কাটাকাটি।'

অনুত্তমের দুচোখে উজ্জ্বলতা বাড়ে। সুকান্তও বুঝতে পারে, অল্প আলাপেই বুড়ি যেন হড়পা বানে ভেসে যাচ্ছে। দুঁদে গোয়েন্দা এবার নাকে দড়ি দিয়ে ঠিক টেনে আনবেন সঠিক মুহূর্তে। অনুত্তম সিগারেট ধরায়। সিগারেটের গন্ধে যে রমা মাসির দুরবস্থা বাড়ে, সেটাও বোঝা গেল।

সিগারেট হাতে অনুত্তম উঠে দাঁড়ায়। নিজের চেয়ারটাকে সমকৌণিক করে রমা মাসির দিকে খানিক ঝুঁকে প্রশ্ন করে, 'তাঁর মানে, আপনি বলতে চাইছেন, সত্যনারায়ণ সরকার তাঁর স্ত্রী জিনিয়া সরকারের গুলিতেই প্রাণ হারিয়েছেন! তাই তো?'

রমা মাসি আর্তনাদ করে ওঠে, 'আমি এমন কথা কখন বললাম গা! আর ওটা হবেই বা কী ভাবে? মামণি মানে জিনিয়া বউদি তো তখন মিছিল সাজাবেন বলে পা বাড়াতে চলেছেন। যাবার আগে বাবুর সঙ্গে কী যেন বলতে বন্ধ দোকানে ঢুকলেন। বাইরে তখন মহা হল্লাগুল্লা। আর আমাকে তো নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়। রান্নাঘরে আছি। বউদিদির ডাক কানে এলো। কোনোরকমে নীচে নামলাম। বউদিদি বললেন, কোলাপসিবলটা টেনে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিতে। এ কাজ তো আমিই করে থাকি। সেটাই করে আবার উঠে গেলাম রান্নাঘরে।'

টানা বলে গেল রমা মাসি। তারপরই আচমকা তার কান্নায় ভেঙে পড়া। কাঁদবার সময় মুখ গহ্বর খুলে যায়। দেখা গেল দুই সারি অটুট গুটকা খাওয়া বাদামি বর্ণের দাঁত।

বেমক্কা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়ে অনুত্তম, 'এই বুড়ি, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব। গপ্প ফাঁদবার আর জায়গা পাওনি? পুলিশ কতটা তোমাকে নাজেহাল করতে পারে, জানো? ছুতো-নাতায় মিসেস সরকারের কাছ থেকে তো ভালোই মালকড়ি পেয়ে থাকো।'

আবার সেই আর্তরব, 'কী সব বলছেন?'

বুক চিতিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে অনুত্তম বলে, 'একদম ঠিক বলছি। অত গুটকা কেনার পয়সা কে যোগায়? আজ বের হবার আগে মিসেস সরকার কত টাকা দিয়ে গেছেন তোমাকে? মিথ্যা বলার চেষ্টা করলে ঠেলতে ঠেলতে ঢুকিয়ে দেব লকারে।'

ফোঁপানো ও জড়ানো গলায় উত্তর এলো, 'কুড়ি টাকা।'

‘কে এনে দিল ওই টাকায় তোমার গুটকা?’

‘কেউ এনে দেয়নি, বাপ। আমি নিজেই কিনে এনেছিলাম সুমনের দোকান থেকে।’

‘সেটা কোথায়?’

‘বাস স্ট্যান্ডের কাছে।’

‘তার মানে, বাড়ির দরজা খোলা রেখেই চলে গেলে গুটকা কিনতে?’

বুড়ি নিরুত্তর। কাঁপুনি আবার বাড়ছে।

‘তখন সময় কত?’

‘সাড়ে সাতটা।’

‘তখনও নিশ্চয় ময়দানে যাবার লোকেরা ভিড় করে রয়েছে?’

‘ছিল তারা। কে কোন গাড়িতে উঠবে, তাই নিয়ে চেল্লাচেল্লি।’

‘আর তা থামাবার চেষ্টা করছেন ফরিদ আহমেদ এবং জিনিয়া সরকার। ঠিক বলছি তো?’

‘একদম ঠিক। এমনভাবে বলছেন, যেন সেই সময় আপনি ওখানেই ছিলেন।’

‘আমি যে আরও কিছু দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি বলেই তো উঠি উঠব করেও উঠতে পারছি না। আঁকশি দিয়ে নামিয়ে আনছি একটার পর একটা জ্যান্ত ছবি। এই বাড়িতে আজ সকাল থেকে কে কী করেছে, সব দেখতে পাচ্ছি এই খুনের ঘরে সাহেনশার মতো বসে থেকেও।’

‘দেবত্বর মতো, কিন্তু যেন বৈরাগ্যের গলায় কথাগুলি বলে গেল অনুত্তম চৌধুরী। মামার আগ্রহ ও সুকান্তের বিস্ময়— এই দুই মিলে তৈরি হয়েছে প্রচ্ছন্ন এক গর্বের ক্ষেত্র। প্রতিক্রিয়ারও একটা সময়সীমা থাকে। সেই সীমার মধ্যেই কোনো ভাবনা প্রসূত নয়, স্রেফ আতঙ্কপ্রসূত কম্পনে শিহরিত রমা মাসি এক রকম চিৎকার করে ওঠে, ‘কী দেখতে পাচ্ছেন?’

প্রতিক্রিয়ায় তীক্ষ্ণ হাসি হেসে অনুত্তম বলতে থাকে, ‘এই তো সেই পরিষ্কার নকশাটা। জিনিয়া সরকার পথে লাইন ম্যানেজমেন্টের কাজ ফেলে রেখে সাঁ করে ছুটে এসে গেলেন তোমার কাছে। ব্লাউজের ভেতর থেকে বের করে আনলেন এক থাবা পাঁচশো টাকার নোট। গুঁজে দিলেন সেইগুলিকে তোমার বুকের মধ্যে। কী হাসি হাসি মুখ তোমার! অত টাকা জীবনে দেখোনি। কী বুড়ি, তুমিও ছবিটা ঠিক দেখতে পাচ্ছো তো? নাকি আরও বিশদে বলতে হবে?’

রমা মাসির দুই চোখে অর্ধগোলাকৃতি রক্তের গুটি কয়েক দানা ঘুরছে। সে যেন কোনো প্রেক্ষাগৃহে বসে একটি খুনে দৃশ্য দেখছে। এই হাট্টাকাট্টা লোকটা তাকে সেই ছবিটা দেখিয়েই ছাড়বে— যে গোপন মনসবদারিতে সবটাই নিখুঁত নয়, কিন্তু প্রায় হুবহু। স্নায়ুর চাপে পর পর মাসিকে সামাল দিলেন সুকান্ত বাগচি। রমা মাসি বিড় বিড় করছে, ‘মোটেই এক থাবা পাঁচশো টাকার নোট নয়। মাত্তর তো সাতখানা একশত টাকার নোট। তবুও টাকা তো! আমি কী সাড়া না দিয়ে পারি!’

অনুত্তম টেবিলে চাপড় মারে, ‘ছিঃ ছিঃ ছিঃ, মাত্র সাতশো টাকার লোভে অত বড় মিসহ্যাপ। পিস্তল হাতে কানাকুঠুরির মতো দোকানটায় ঢুকে মইয়ের দু-ধাপে উঠে গুলি করে মারতে পারলে সরকারবাবুর মতো মানুষকে! ছিঃ!

মাসি এবার সত্যি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খায়, অস্ফুট গলায় বলতে থাকে, ‘আমি গুলি করিনি, বাবু। আমি কেবল পরে মইটাকে ঢাকাঢুকি দিতে সাহায্য করেছি। পিস্তল ওপরে রাখবার সময় মইটা যাতে নড়বড় না করে তার জন্য চেপে ধরেছিলাম ওর দুটো ধাপকে। সাতশো টাকার জন্য এটা তো করা যায়!’

অনুত্তমের গলাও চাপা, ‘জিনিয়া সরকার যে গুলি দুটো ছুঁড়লেন, শব্দ হয়নি?’

রমা মাসির জবাব, ‘হয়েছিল। কিন্তু বাইরে তখন বউদিমণির মেয়ে মানুষরা কোন গাড়িতে ছানাপোনাদের নিয়ে উঠবে, তাই নিয়েই খুব হল্লা করছিল। গুলির আওয়াজ কারোর কানে ঢোকেনি।’

জিনিয়া সরকারের খাস আলমারিটার তালা ভাঙতেই মিলে যায় প্রার্থিত সাবুদ। একখানা ঝাঁ চকচকে অ্যালবাম। ভেতরের পাতায় পাতায় ফরিদ আহমেদ এবং জিনিয়া সরকার। এমন সমস্ত ছবি, যাদের সঙ্গে তুলনীয় বিজ্ঞাপনের সেই অভিপ্রকাশ — যাদের অনুত্তমের মনে হয়েছে, পর্নোগ্রাফির চেয়েও অশ্লীল।

কান তো নিরবধি। দুপুর তিনটে নাগাদ সদানন্দের কমদামি ফোন হাঁক মারে। সুইস টিপতেই জিনিয়া সরকারের উৎকণ্ঠায় কম্পমান স্বর, ‘সব ঠিক আছে তো, সদানন্দ?’

সদানন্দ পুলিশ অফিসার সুকান্ত বাগচির দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে, বলে, ‘সব ঠিক আছে বউদিমণি! কেবল বাবু সেই যে কোন ভোরে দোকানে ঢুকেছিলেন, আর বের হননি।’

বলেই ফোনটাকে বোবা করে দেয় সদানন্দ। ■

হিন্দু জাতীয়তাবাদের আখ্যান

জয়ন্ত ঘোষাল

প্রথম যেবার শ্রীনগর গিয়েছিলাম, সে বহুবছর আগের কথা। সেবার কাশ্মীরের প্রাচীনতম শিব মন্দিরটি দেখে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। অনেক সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়েছিল। ইতিহাস বলে, সেই কোন সুদূর দক্ষিণ দেশ থেকে এসে শঙ্করাচার্য এই মন্দিরটি স্থাপনা করেন। সেদিন বারবার মনে হচ্ছিল, দিল্লিতে বসে কাশ্মীর বললেই মনে হয় এটি তো মুসলমান সমাজের ভূখণ্ড। চারার-ই-শরিফ বা হজরতবাল সর্বত্র গেছি, কিন্তু কাশ্মীর মানেই যে মুসলমান শাসনের ইতিহাস নয় সে কথা কেউ মনে করিয়ে দেয় না।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী পড়লে বোঝা যায়, এই কাশ্মীর শহরটিতে কতখানি হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। হিন্দু রাজাদের শাসনকালেও এই অবিভক্ত জম্মু কাশ্মীর লাদাখ সর্বত্র এক অসাধারণ বহুত্ববাদ ছিল। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সব রকমের মানুষ ছিল।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী তদানীন্তন কাশ্মীরের সমসাময়িক ইতিহাসের দলিল। সেসময় সুশাসন যেমন ছিল, ঠিক তেমনভাবে অপশাসনও ছিল। এমন কোনো শাসন হয় না যেখানে সু আর কু-এর সহাবস্থান হয় না, এটাই ইতিহাসের নিয়ম। কিন্তু আজ স্বাধীনতার এতগুলো বছর পর মনে হচ্ছে মস্ত বড়ো ভুল হয়ে গেছে। কাশ্মীর থেকে হিন্দু উদ্বাস্তু পণ্ডিতরা জম্মুতে ও অন্য রাজ্যে পালিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেই হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য কতটা সময় দিয়েছিলেন? তখন কেন তিনি শেখ আবদুল্লাকেই খুশি রাখতে ব্যস্ত ছিলেন? তখনও কি তিনি দেশভাগের পর পাকিস্তানের কাশ্মীরি মুসলমানদের ওপর প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন? সেদিন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেভাবে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নিয়ে সোচ্চার হন, এমনকী সর্দার প্যাটেলও যেভাবে কাশ্মীরের বিতাড়িত হিন্দুদের জন্য সোচ্চার হন, নেহরু তা হননি। উল্টে সেসময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক সমাজ মনে করত যে, ভারতে হিন্দু মানে কংগ্রেস নয়, হিন্দু মানে হিন্দু মহাসভা। হিন্দু জাতীয়তাবাদ মানে হিন্দু সংকীর্ণতা। কিছু ধনী বানিয়া, যাদের শিক্ষাদীক্ষা নেই, ভালো করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না, জুতো পরে না, খালি পায়ে হাঁটে, নিরামিষ খাবার খায়, আর ফলের রস খায়। উপন্যাসকার পল স্কট লেডি লিলি চ্যাটার্জির মতো এক patritian lady-র জবানিতে সেই সময় হিন্দুদের এভাবে বর্ণনা করা হয়। সম্প্রতি স্বপন দাশগুপ্ত তার

Awakening Bharat Mata : The Political Beliefs of the Indian Right গ্রন্থের ভূমিকায় এই ধরনের বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন, যা থেকে জানা যাচ্ছে বিদেশি কূটনীতিক ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাতরা ভারতীয় হিন্দুদের অশিক্ষিত কিছু বৈশ্যদের ব্যাপার বলে মনে করত। ভারতের অন্তরাত্মায় যে হিন্দু মনোভাব জীবিত ছিল, তা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকায় প্রবাহিত ছিল। কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করেছিল এই অভিজাত ব্রিটিশ ভক্তরা। নেহরু নিজেও 'RSS mentality' বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। সেদিন তাই নেহরু যে বহুত্ববাদের কথা বলেছিলেন, যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বা তারও আগে লন্ডনের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হন, তা ভারতে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নেহরু ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হিন্দু চেতনাকে অবজ্ঞা করেন। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির এই মানসিকতা কিন্তু আজও সেই একইভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আর তাই আজ হঠাৎ দুর্বল এই শক্তি গেল গেল রব তুলে আর্তনাদ করেই চলেছে। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুরু হয়ে এবার ২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতাসীন হওয়ার পরও অভিযোগ উঠছে যে হিন্দি ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের নামে এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং অসহিষ্ণুতা বাড়ছে।

এই আখ্যানটি হলো নেহরুবাদী সুপ্রাচীন আখ্যান। জনসঙ্ঘ প্রথমে, পরে বিজেপি এবং ১৯২৫ সালের জন্মলগ্ন থেকে আর এস এস এই নেহরুবাদী আখ্যানটির বিরুদ্ধে এক পাল্টা হিন্দু জাতীয়তাবাদী আখ্যান তুলে ধরার চেষ্টা করছে। এই লড়াইটা আসলে চিরকালই ছিল, তবে মানুষের বিপুল ভোটে জেতার পর বিজেপি তাদের এতদিনের সযত্নে লালিত ভাবাদর্শকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করবে এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক এক ঘটনা। ফলে ভারতের রাষ্ট্র চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক না উদার গণতান্ত্রিক সেসব তো চলতেই থাকবে। মূল বিতর্ক তা নয়, মূল বিতর্ক হওয়া উচিত যে ভারতীয় সভ্যতার শিকড় এক হিন্দু ধর্ম চেতনার মধ্যে নিহিত আছে। সেই সহজ সরল ঐতিহাসিক সত্যকে আজ মানার সময় এসেছে কিনা ! অনেকে বলেন, নেহরুবাদী ভারত আখ্যানের বিরুদ্ধতায় মোদীর পাল্টা ভারত আখ্যানের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। আসলে তা সত্য নয়। সত্য হলো, ভারতের আদি আখ্যান যেটি বেদ-উপনিষদ-গীতা থেকে আদি শঙ্করাচার্য রচনা করে দিয়ে গেছেন, সেটিকে ১৯৪৭ সালের পর কংগ্রেস নেতৃত্ব বিস্মৃত হয়ে বিদেশি পাশ্চাত্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রকে ভারতীয় রাজনীতিতে আনেন, ক্রমশ সেটিকেই ভারতীয় মূলস্রোত বলে আখ্যা দেওয়া হয়। হিন্দু ধর্মের মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য ছিল শৈব, বৈষ্ণব এবং শাক্ত। ন্যায় বৈশোষিক দর্শন থেকে কপিলের সাংখ্য চার্বাক মতবাদ এবং বৌদ্ধ দর্শনও দরজায় কড়া নাড়ে। হিন্দুধর্ম এমন এক ধর্ম যেটি কোনো একজন ব্যক্তির মতবাদ নয়, এ ছিল এক সভ্যতা। এ ছিল এক way of life। ভারতীয় জীবন চর্যা। তাই বিতর্ক হিন্দু ধর্মের মধ্যেও ছিল। বিতর্ক আলাপ-আলোচনা কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু তার মানে হিংসা এবং অসহিষ্ণুতা নয়। বামপন্থী তথাকথিত উদারবাদীরা বলতে চান আর এস এস এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা এবং হিংসা নামক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। কতিপয় ব্যক্তি যদি গো-রক্ষক বা উগ্র হিন্দুত্ববাদী সেজে হিংসার ঘটনায় জড়িত হন, তাহলে কিন্তু সেই বিচ্ছিন্ন বিচ্যুতিকে সঙ্ঘের দর্শন বলে প্রচার করা অন্যায়। মাওবাদীরা হিংসার আশ্রয় নিলে সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থাশীল মার্কসবাদীরা বলেন, মাওবাদীদের হিংসা বিচ্যুতি। তবু হিন্দু কোনো সংগঠন তো এতটা বিচ্যুত হয়নি, যেখানে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের জন্য কোনো ঘোষিত সশস্ত্র সংগঠন তৈরি করা হয়েছে।

মহাভারতে আছে, 'Sukshma Vivado Vipranam Shula Kshatro Jayayayao' অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা বিনম্র বিতর্কের মধ্য দিয়ে জয়-পরাজয়ের বিচার করেন আর ক্ষত্রিয়রা ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এমনকী, ম্যাক্স ওয়েবারের মতো সমাজতাত্ত্বিকও ভারত গবেষণা করে বলেছিলেন, 'It is an undoubted fact that in India, religious and philosophical thinkers were able to enjoy perfect, nearly absolute freedom for a long period. The freedom of thought in ancient India was so considerable as to find no parallel in the west before the most recent age'।

স্বাধীনতার আগে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ ছিল এক মুক্ত মঞ্চ। সেই কংগ্রেসে বালগঙ্গাধর তিলকের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ছিল যাকে আজকাল তাত্ত্বিকরা অভিহিত করেন Tilak mechanism' আবার বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ যাদব থেকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের প্রধান নেপথ্য শিল্পী মদনমোহন মালব্য, বল্লভভাই প্যাটেল— এঁরা সকলেই ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে এগোতে চেয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতাকে একেবারে ঝুঠা কমিউনিস্টদের মতো কখনোই বলবো না, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা জন্মসূত্রে প্রতিবন্ধী ছিল। অনেকে বলেন, স্বাধীনতা নয়, এ হলো

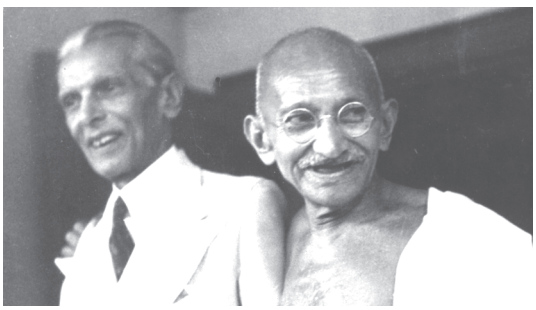

ক্ষমতার হস্তান্তর মাত্র। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে জন্ম নিয়েছিল এক ডোমিনিয়ন। একদিকে পশ্চাদপসরণ করেও ব্রিটেন নিজের স্বার্থ ভোলেনি, অন্যদিকে রণ-ক্লান্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের এক অপ্রতিরোধ্য ভারতকে লড়তে হয়েছে দুই দিকে। একদিকে ছিল সাম্রাজ্যবাদ আর অন্যদিকে ছিল সাম্প্রদায়িকতা, এমনকী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও লড়তে হয়েছিল কংগ্রেস নেতৃত্বকে। সে সময় সাম্প্রদায়িকতাকে ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ প্রশ্রয় দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বেশ কিছু কংগ্রেস

নেতা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ব্রিটিশ কৌশলের ফাঁদে পড়ে যান। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবে নরম মনোভাব নিতে গিয়ে কখন কীভাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, তা কংগ্রেস নেতারা টের পাননি। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো ঐতিহাসিকও লিখেছেন, গাঁধী, নেহরু ও সুভাষচন্দ্র ছাড়া সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক নেতা স্বাধীনতার আগে বোধহয় কাউকে বলা যায় না। এই সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বিবাদ তাই সুপ্রাচীন। নতুন ঘটনা হলো, নরেন্দ্র মোদী ভারতের সিংহাসনে আসীন হয়ে প্রথম ঘোষণা করেছেন যে, এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতটিকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে, এটি হলো ভারতীয় কণ্ঠস্বর। অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হবার পর কিন্তু এই ভারত চরিত্র নির্মাণ, বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক হয়নি, কিন্তু কেন হয়নি? আমার মনে হয়, প্রথমত, বাজপেয়ী জামানায় বিজেপির সরকার ছিল না, তখন জোট শরিক দলের নেতাদের শর্ত মেনে চলতে হতো তৎকালীন এনডিএ সরকারকে। দ্বিতীয়ত, বাজপেয়ী নিজেও নেহরু ভক্ত ছিলেন। তিনি যখন প্রথম সংসদীয় রাজনীতিতে পদার্পণ করেন তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। একদিন তো বাজপেয়ীর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ নেহরু নাকি বলেছিলেন, তুমি একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারো। বিদেশমন্ত্রী হয়ে বাজপেয়ী যখন ১৯৭৭ সালে সাউথ ব্লকে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন কোনো অত্যুৎসাহী আমলা সাউথ ব্লকে রক্ষিত নেহরুর এক বিশাল চিত্র সরিয়ে দেন। বাজপেয়ী সেই ছবি না দেখতে পেয়ে অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেন, নেহরুর সেই ছবিটি দেখা যাচ্ছে না কেন? বাজপেয়ীর নির্দেশে স্বস্থানে ছবিটি আবার বহাল হয়। এ ঘটনায় আমি মনে করি, বাজপেয়ী ঠিক কাজই করেছিলেন। নেহরুর ছবি সরিয়ে ফেলা, এ তো অনেকটা নকশালদের বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙার মতো ভাবনা। নেহরু ভারতের ইতিহাসের এক সফল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নিরবচ্ছিন্ন ভারতের সমালোচনা করা অনাবশ্যক। আজ দলীয় রাজনীতিও বড়ো 'হ্যাঁ' অথবা 'না'-এই ধরনের সাদা এবং কালো দুই চরমপন্থী মনোভাবের দাসত্বের শিকার। নেহরুর গুরুত্ব স্বীকার করেও বলতে হবে, তিনি অনুসন্ধিৎসু চিত্তে ভারত আত্মার অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীর মতাদেশ থেকেও আসলে তিনি ছিলেন অনেক দূরে। বরং সুভাষচন্দ্র বসু এবং নেহরু দুজনেই সমাজতন্ত্র এবং পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার মডেল অনুসরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গ আমাকে উত্থাপন করতেই হবে। দেখুন, ১৯২৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম, আবার এই ১৯২৫ সালে আর এস এসের মতো সংগঠনেরও জন্ম। আজ গোটা দেশে কোথায় মার্কসবাদীরা আর কোথায় সঙ্ঘ পরিবার। কেরল আর পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কমিউনিস্টরা কোথাও নেই। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি এক নতুন শক্তি হিসেবে মাথাচাড়া দিয়েছে। এমন তো ছিল না। গোটা দেশে ডাঙ্গের মহারাষ্ট্র, সুরজিতের পাঞ্জাব, সিতারামাইয়ার অন্ধ্রপ্রদেশ— কোথায় গেল সেই হারানো ক্ষমতা! দিল্লিতে আজও আছে অরুণা আসফ আলি রোড। অরুণা আসফ আলি দিল্লি পুরসভার প্রথম মেয়র হন। তখন দিল্লিতে জনসঙ্ঘ এবং আর এস এস দুর্বল শক্তি, আর আজ কমিউনিস্টরা কোথায়? কেন এমন হলো অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দেন। কমিউনিস্টরা বলেন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ভারতীয় কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা এবং তারপর স্তালিনীয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতীয় মার্কসবাদ প্রসারিত হতে পারেনি। আমি বলি, আর এস এস ভারত ভাবনাকে মূলধন করে সামাজিক উন্নয়ন ও বিকাশের পথে এগোলো। তাই পেয়েছিল জনসমর্থন, যা কমিউনিস্টরা করেনি। ১৯৪৭ সালের জুলাই, আগস্ট ও ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মার্চ-এর মধ্যে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। পি সি যোশীর নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো বি আর রণদিভের নেতৃত্বকে গ্রহণ করে।

রজনী পাম দত্ত লন্ডনে থাকতেন। তিনি নেহরুর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। জাতিপুঞ্জে নেহরুর ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি।

তখন কমিউনিস্টরা ছিলেন নেহরুভক্ত, কিন্তু গান্ধী বিরোধী। আর সবচেয়ে বেশি বিরোধী ছিলেন সর্দার প্যাটেলের। কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল, দলের বাইরে বামপন্থী কংগ্রেসের ভেতরকার প্রগতিশীল সবাইকে নিয়ে সরকার গড়তে হবে। তবে রণদিভে অবশ্য এই কংগ্রেস প্রেমের নীতি বদলে দেন। আবার ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় মাউন্টব্যাটেন তো গান্ধীকেই দূরে সরিয়ে শেষ বোঝাপড়ায় নেহরুকে গুরুত্ব দেন। দেশভাগের সিদ্ধান্ত গান্ধীকে বাদ দিয়ে করা হয়েছিল। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো ঐতিহাসিকও লিখেছেন, গান্ধীকে ব্ল্যাকমেল করা হয়। দেশভাগ নিয়ে কথা বললে নেহরু-প্যাটেলরা ইস্তফা দেবেন এমন কথা গান্ধীকে বলা হয়েছিল।

আজ এত বছর পর নরেন্দ্র মোদী মানুষের সমর্থন নিয়ে এগোচ্ছেন। তিনি একদিকে আধুনিক নেতা। অর্থনীতিতে খোলাবাজারের সংস্কারে বিশ্বাসী। সরকারের সামন্ততান্ত্রিক ভূমিকাকে তিনিও অনেকটাই খর্ব করে দিচ্ছেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তোলাও তাঁর অগ্রাধিকার। সাধারণ ভাবে মানুষ জাতি, রাষ্ট্র ও সরকার— এই তিনটি বিভাগকে একই বলে মনে করেন। আসলে সরকার প্রশাসনের কেন্দ্র, কিন্তু জাতি অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক সত্তার মতো। জাতির শরীরের উপাদন রাষ্ট্র ও সরকার, কিন্তু জাতি মানে জাতীয়তার এক বিমূর্ত ধারণা। অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব ছিল জৈব তত্ত্ব। সেখানে রাষ্ট্র প্রাণীর শরীরের মতো। বস্তুর মতো। কিন্তু নেশনের ধারণা হলো পুঁজিবাদের উন্মেষের প্রাক লগ্নে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে। আজ মোদী এই জাতি ও জাতীয়তা ভাবনার পুনঃ পর্যালোচনা শুরু করেছেন। এতে সমস্যা কোথায়? বালগঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, শুধু স্বরাজ্য নয় হিন্দু ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শিবাজীর আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'তব ভাল উদ্ভাসিয়া তড়িৎ প্রভাব এসেছিল নামি /এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দেবো আমি।' রবীন্দ্রনাথ একথা লিখেছেন, তবে মার্কসবাদীরা আজও শিবাজীকে বর্গী দস্যু বলে মনে করেন। পূর্ব ভারতে মুসলিম আলিবর্দি খাঁ তাদের আক্রমণ থেকে জনগণের জান-মান রক্ষা করেন। এখন প্রশ্ন হলো, গোটা দেশের মানুষদের মধ্যে যদি অভিমত সংগ্রহ করা হয়, পরীক্ষা হয়, তাহলে আমার কিন্তু মনে হয় সাধারণ ভারতীয় আমজনতা শিবাজী মহারাজকে 'দস্যু' বলে মনে করে না। তিনি মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, আবার ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়েও তো শিবাজীকে ব্যবহার করেছিলেন চরমপন্থী তিলক।

আজ এত বছর পর যদি ভারতের জাতীয়তাবাদের হিন্দু উপাদান নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়, তবে তা অবশ্যই স্বাগত জানানো প্রয়োজন। একটা ছোট পুরনো গল্প শুনিয়ে লেখা শেষ করব। ব্রিটেনের সংসদে গিয়েছিলেন ভারতের সাংসদদের এক প্রতিনিধি দল। তখন লোকসভার স্পিকার ছিলেন রবি রায়। ব্রিটেনে অবস্থানকাল ওই প্রতিনিধি দল একটি নৈশভোজে গেছেন। দলে ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। টেবিলে ওর একপাশে বাসুদেব আচার্য, অন্যদিকে এক ইহুদি সাংসদ। টেবিলে খাবার দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ আহারে হাত দিচ্ছেন না। আসলে প্রথা ছিল চ্যাপলিন আসবেন। প্রার্থনা হবে, তারপর সংসদীয় নৈশ ভোজ শুরু। আদবানি বললেন, বাসুদেববাবু আপনি তো কমিউনিস্ট। নাস্তিক হওয়ার কথা। আর আপনি তো ইহুদি। তাহলে খামোখা খ্রিস্টান প্রথা সবাইকে মানতে হচ্ছে কেন? সে প্রশ্নের জবাব ছিল, লন্ডনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ খ্রিস্টানদের। তাই সংসদে এই প্রথা। পাশ্চাত্যবাদী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ভারতীয়রা ব্রিটিশ প্রথা সম্পর্কে নীরব চিরকাল।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

ধুলো

সন্দীপ চক্রবর্তী

বয়েস বাড়লে দৃষ্টি না দৃশ্য কোনটা বেশি ঘোলাটে হয়ে যায় রমেন রায়চৌধুরী ঠিক আন্দাজ করতে পারেন না। ঘরের দুটো জানালাই খোলা। সেই কখন থেকে তিনি ঠাহর করার চেষ্টা করছেন, এখন সকাল না সন্ধ্যা। কিন্তু দলা দলা কুয়াশা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না।

কোনো শব্দ কি শুনতে পাচ্ছেন? কান খাড়া করলেন রমেনবাবু। মনে হলো পাচ্ছেন। একটানা ঘড়ঘড় একটা শব্দ। এ শব্দ তার চেনা।

আশ্বস্ত হলেন রমেনবাবু। যাক। আজ তা হলে কফের জঞ্জাল সরিয়ে বুকের ভেতর হাওয়া খেলছে। নয়তো এখনই বুকে গরম তেল মালিশ করতে হতো।

এই এক জ্বালা। আলো আছে, মাটি আছে, জল আছে, কিন্তু হাওয়া নেই। অন্তত তার জন্য নেই। এ কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড রে বাবা! পৃথিবীতে প্রাণী থাকবে আর তাদের নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত হাওয়া থাকবে না? এসব কথা মনে পড়লে রমেনবাবু রেগে যান। চাকর নন্দকে গালিগালাজ করেন। যেন নন্দর জন্যই তার শ্বাসকষ্ট।

সোনালদি গ্রামের লোকে বলে, বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। তাদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। বয়েস হয়েছে বই কী রমেনবাবুর। গত চৈত্রে পঁচাত্তরে পা রেখেছেন। আধিব্যধিরও শেষ নেই। তাপমাত্রায় সামান্য হেরফের হলেই হাঁপের টান এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে মনে হয় এ যাত্রায় বুঝি আর টিঁকলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকে যান। তার টিঁকে থাকার রহস্যভেদ করতে না পেরে গ্রামের ছেলেছোকরারা বলে, 'উনি কীভাবে যমদূতকে কলা দেখান উনিই জানেন।'

কথাটা ঠিক। রমেনবাবু জানেন। তার ধনুর্ভাঙা পণ। যতদিন না তার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র শোভেন ফিরে আসে ততদিন তিনি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। স্বর্গেও না।

উঠে বসলেন রমেনবাবু। এপাশ ওপাশ নজর করে বুঝলেন কুয়াশা আর নেই। দিব্যি দেখা যায়। হরিশচন্দ্রের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বিশাল তৈলচিত্রের মধ্যে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। আগে বাবার ছবিতে প্রণাম করে দিন শুরু করতেন রমেনবাবু। এখন আর করেন না। মৃত্যুর মতো মৃতদেরও তিনি মুছে ফেলতে চান। হরিশচন্দ্রের পাশে আরও তিনটি বিশাল তৈলচিত্র। শতাধিক বছরের দীর্ঘশ্বাসের ভারে কালো হয়ে গেছে রংয়ের আঁচড়। কেউ বলে দিলে জানা যায়, ছবিগুলো রমেনবাবুর পিতামহ গোপালচন্দ্র, প্রপিতামহ অনুকূলচন্দ্র এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রতাপচন্দ্রের।

ছবি দেখতে দেখতে রমেনবাবু হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রাগ নন্দর ওপর। অনেকবার হতভাগা চাকরটাকে ছবিগুলো জঞ্জালের গাদায় ফেলে আসতে বলেছেন, কিন্তু সে ফেলেনি। রাগের চোটে বিড় বিড় করতে থাকেন রমেনবাবু। তোর কীসের এত টান রে শুয়োর। ওই মানুষগুলো তোর কে? যত্তসব মরাহাজা। আমাকে এখনও বিশ বছর বাঁচতে হবে। শোভেনের হাতের জল না খেয়ে আমি কোত্থাও যাব না।

রমেনবাবুর মনে হলো, খাট থেকে নেমে বাইরে যাওয়া দরকার। কিন্তু সাহস পেলেন না। খাটটা সাধারণ খাট নয়। পালঙ্ক বিশেষ। হরিশচন্দ্রের বিবাহে দানসামগ্রীর সঙ্গে এসেছিল। রমেনবাবুর মা তরুবালা তখন তেরো বছরের কিশোরী। মেয়ে এত উঁচু পালঙ্কে উঠতে পারবে না বলে রমেনবাবুর দাদামশাই অবিনাশ মিত্তির একটা নীচু জলচৌকি তৈরি করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তরুবালা জলচৌকিতে পা দিয়ে পালঙ্কে উঠতেন।

রমেনবাবুর জীবনে ওঠার মতো আর কোনও শীর্ষদেশ অবশিষ্ট নেই। এখন শুধুই নামা। কিন্তু তার জন্যও তো নন্দর হাত, নয়তো তরুবালার জলচৌকির প্রয়োজন। অন্যথায় ভারসাম্য রাখতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন। তিতিবিরক্ত হয়ে রমেনবাবু হাঁক পাড়লেন, 'নন্দ! অ্যাই নন্দ!'

নন্দর সাড়া পাওয়া গেল না। তার বদলে সাড়া দিল একটা কুকুর।

রমেনবাবু বুঝলেন নন্দ বাড়িতে নেই। সদর দরজা আগলে বসে আছে ফুলি। এ পাড়ার মাদি কুকুর। ফুলিকে ট্রেনিং দিয়েছে নন্দ। সে কোথাও গেলে ফুলি রমেনবাবুকে জানিয়ে দেয় নন্দ বাড়িতে নেই। তবে ফিরে আসবে এখনই।

টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করে নন্দ যখন বাড়ি ফিরল, রমেনবাবু তখনও খাটের ওপর থম মেরে বসে আছেন। চরাচরে লেপ্টে থাকা কুয়াশা এখন আর একেবারেই নেই। জানলার ওপারে রায়চৌধুরীদের বিশাল জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। সোনালদি, বোষ্টমপাড়া, সোনারচক, বাবুডাঙার লোকেরা এখনও এই বাড়িকে বলে রাজবাড়ি। অথচ যে দরবারঘরে বসে প্রজাশাসন করতেন অনুকূলচন্দ্র সেখানে এখন সাপখোপের আড্ডা। বিশাল বিশাল বট আর অশ্বত্থ ছাদ ফাটিয়ে মাথা তুলেছে আকাশে। বেঁচেবর্তে থাকা দুটি মাত্র ঘরে রমেনবাবু আর নন্দ থাকেন।

পায়ের শব্দ পেয়ে রমেনবাবুর সম্বিত ফিরল। নন্দকে দেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'এই যে আমার লাটসাহেব! কোন রাজকার্যটা করছিলেন শুনি?'

এই ধরনের সম্ভাষণের সঙ্গে নন্দ পরিচিত। চল্লিশ বছর হয়ে গেল তার এ বাড়িতে। রমেনবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে সাহায্য করার জন্য দশ বছর বয়সে এসেছিল। তারপর কত কী ঘটে গেল। শোভেন গৃহত্যাগ করল। অন্নপূর্ণা মারা গেলেন। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো রায়চৌধুরীদের সাধের রাজবাড়ি। থেকে গেলেন শুধু রমেন রায়চৌধুরী। তার আশা শোভেন ফিরবে। এবং ছেলেকে দেখে তিনি শান্তিতে মরতে পারবেন।

গালিগালাজ শুনে প্রথম প্রথম নন্দর রাগ হতো। এখন দুঃখ হয়। করুণা হয় মানুষটার জন্য। সে শান্ত গলায় বলল, 'কয়েকটা জিনিস ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই দোকানে গিয়েছিলুম।'

'দোকানে গিয়েছিলুম— তোকে এই ছবিগুলো ফেলে দিতে বলেছিলুম।

ফেলিসনি কেন?'

'আজ্ঞে, পূর্বপুরুষের ছবি ফেলে দেবেন?'

'আমার পূর্বপুরুষের ছবি আমি ফেলে দেব তাতে তোর বাপের কী রে শালা! যা বলছি তাই করবি।'

নন্দ কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'বলছেন যখন তাই করব। ছবি না থাকলে গাল পাড়বেন কাকে?'

কেমন যেন থিতিয়ে গেলেন রমেনবাবু। কথাটা ভুল বলেনি নন্দ। কাউকে পোড়াতে না পারলে তো নিজেই নিজের আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। বিচারক এসে দেখবে অপরাধী নেই। শাস্তিই সার হবে, জীবনে ক্ষমা আর জুটবে না।

রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে রমেনবাবু মৃদু গলায় বললেন, 'তুই এখন যা নন্দ। আমায় একা থাকতে দে।'

দুই

বর্ষার শুরুতেই ক'দিন বেশ বৃষ্টিবাদলা হয়ে গেল। শীত আর বর্ষাকে নন্দর বেশি ভয়। এই সময় রমেনবাবু খুব কষ্ট পান। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। অসুস্থ হয়ে পড়লেন রমেনবাবু।

নিদারুণ শ্বাসকষ্টে কথা বন্ধ হয়ে গেল। সারাদিন বাতাসের খোঁজে মানুষটা ছটফট করেন আর বোবা চোখে চেয়ে থাকেন দূরে। এ দৃষ্টি নন্দ চেনে। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে ডাকে। রমেনবাবুর ঈশ্বর নেই। শোভেন আছে। রমেনবাবু ছেলেকে ডাকেন। একমাত্র সেই পারে অনুশোচনায় জর্জরিত মানুষটাকে মুক্তি দিতে।

সোনালদির সবে ধন নীলমণি ডাক্তার অবনী ঘোষ ভালো করে দেখেশুনে বলল, 'আমি ওষুধ দিতে পারি নন্দ, কিন্তু রোগ সারাতে পারব না। ওটা তোর কাজ তোকেই করতে হবে।'

নন্দ কিছু বলল না। কারণ কথাটা নতুন নয়। একবার হঠাৎই সে আজগুবি এক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছিল। অবনী ঘোষের নির্দেশে সেবারই প্রথম অক্সিজেনের সিলিণ্ডার এসেছিল বাড়িতে। কিন্তু দিনরাত নলের হাওয়া টেনেও রমেনবাবুর বুকের গুমোট কাটেনি। নেতিয়ে পড়া বৃদ্ধের বুকে গরম তেল মালিশ করতে করতে এমনিতেই নন্দ অনেক কথা বলে। সেদিন কী হয়েছিল কে জানে, আচমকা বলে ফেলেছিল, 'আপনার এরকম বিছানায় পড়ে থাকা চলবে না। উঠে বসতে হবে। শোভেনদা এসে যদি আপনাকে এই অবস্থায় দেখে কত কষ্ট পাবে বলুন তো।'

সেবার এই ঘটনার দুদিন পরেই উঠে বসেছিলেন রমেনবাবু। ব্যাপার-স্যাপার দেখে একদম ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিল নন্দ। এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা! ভোজবাজি নাকি? তার সামান্য একটু সান্ত্বনায় কী আছে যে রমেনবাবু এরকম চাঙ্গা হয়ে উঠলেন? অবনী ঘোষ বুঝতে পেরেছিল রহস্যটা। বুঝিয়ে দিয়েছিল নন্দকে। তারপর রমেনবাবু যতবার অসুস্থ হয়েছেন অবনী ডাক্তার শুধু ওষুধ দিয়েছে। আর নন্দ দেখিয়েছে স্বপ্ন। যে মায়ার বাঁধনে রমেনবাবুর জীবন বাঁধা, তাতে দিয়েছে গিঁট। গিঁটের পরে নতুন গিঁট। বাঁধন শক্ত হতেই রমেনবাবুর শ্বাসকষ্ট একটু একটু করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। উঠে বসেছেন তিনি। সুস্থ হবার পর যথেচ্ছ গালাগাল দিয়েছেন নন্দকে। মানুষটাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারার আনন্দে ভরে গেছে নন্দর মন।

এইভাবেই চলছে গত পাঁচ বছর।

অবনী ডাক্তার চলে যাবার পর নন্দ কাজে লেগে পড়ল। এই শরীরে রমেনবাবুর স্নান করা চলে না। কিন্তু দাড়ি কামিয়ে দিতে হবে। নয়তো খেতে পারবেন না। নন্দ বসল দাড়ি কামাতে। তারপর রান্না। গলা ভাত আর জিরে পাঁচফোড়ন দিয়ে বানানো চারা মাছের ছোল। মা যেভাবে সন্তানকে খাওয়ায়, সেইভাবে খাওয়াতে খাওয়াতে নন্দ শুরু করল তার ডাক্তারি, 'শোভেনদার জন্য আমার দুঃখ হয়। আপনাকে কী দেখে গিয়েছিল আর এবার এসে কী দেখবে! মনে আছে, একসময় আপনি ঘোড়ায় চড়তেন? তখন এ তল্লাটে গাড়ি ছিল না। আপনার শুধু একটা সাদা রংয়ের ঘোড়া ছিল। বাপ রে, সে ঘোড়ার কী তেজ! হাওয়া কেটে তিরের মতো ছুটত। শোভেনদার ঘোড়ায় চড়ার খুব শখ ছিল। আপনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শোভেনদা ফিরে এসে যদি দেখে আপনি...'

আচমকা থেমে গেল নন্দ। ভালো করে দেখল রমেনবাবুকে। আশ্বস্ত হলো দেখে। দৃষ্টিটা আগের থেকে জীবন্ত। ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসির আভাস। অর্থাৎ ডাক্তারিতে কাজ দিয়েছে। এইভাবে চালাতে হবে দু'তিনদিন। তবে রমেনবাবু কথা বলবেন। এই ব্যাপারটা নন্দ ভালো বোঝে না। হাঁপের রুগি তো সে কম দেখেনি। সোনালদিতেই তো দুজন আছে। টান উঠলে তাদের কারও কথা বন্ধ হয় না। কিন্তু রমেনবাবুর হয়। অবনী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে বলে, 'তোর অত জানার দরকার কী বাপু। তুই যেমন ডাক্তারি করিস, করে যাবি। দেখবি চলে যাওয়া কথা আবার ফিরে এসেছে।'

তা, ফিরে আসে বটে। কিন্তু কেন চলে যায় জানতে পারলে নন্দ কখনো যেতেই দিত না। রমেনবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিকটুকু দেখতে দেখতে নন্দ ফিরে গেল ডাক্তারিতে, 'আমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে বুঝি! কেন, হাসি পাচ্ছে কেন? শোভেনদা কি ফিরবে না? সময় হয়ে গেছে। না এসে যাবে কোথায়?

দু'দিন পর রমেনবাবু সুস্থ হলেন।

সাধারণত রোগভোগের পর কথাবার্তা কম বলেন। কিন্তু এবার কথা ফিরে আসা মাত্র হাঁকডাক শুরু করে দিলেন। নন্দকে ডেকে বললেন, 'পণ্ডিতকে একবার খবর দে।'

কথাটা নন্দর পছন্দ হলো না। পণ্ডিত মানে শশধর মুখোপাধ্যায়। হাড়ে হারামজাদা শয়তান একটা। জ্যোতিষীগিরির নাম করে লোক ঠকায়। নন্দ দু'চোক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু রমেনবাবুর খুব বিশ্বাস। প্রত্যেকবার অসুখ থেকে ওঠার পর একবার ডাকবেনই। কাজ কিছুই না। শোভেনের ঠিকুজিটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, 'কবে আসবে বলে মনে করছ?' শশধর ঝানু মাল। হাবিজাবি নানান অঙ্ক কষে বলবে, 'আজ্ঞে, এ বছরই একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে কর্তা। আপনি কিছু ভাববেন না।' তারপর পঞ্চাশ টাকা ট্যাঁকে গুঁজে চটিতে ফটাস ফটাস আওয়াজ করে পিঠটান দেবে।

নন্দ বেজার মুখে বলল, 'ওকে আবার কেন? যা বলে কিছুই তো মেলে না।'

রমেনবাবু চটে গেলেন, 'তুই থামবি! ফলিত জ্যোতিষের কী বুঝিস তুই? বাজে না বলে এখনই যা। বল, খুব জরুরি দরকার। আজই যেন একবার আসে।'

শশধর এলো বিকেলে। রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা। মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়ো। বয়স ষাটের ওপরেই হবে। নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা পিছনে ঠেলে দিয়ে সে ঠিকুজি পরীক্ষা করতে বসে গেল।

'কেমন আছে সেটা কি বলা যাবে?' রমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

শশধর অমায়িক হেসে বলল, 'ছেলে আপনার ভালোই আছে কর্তা। ভালো চাকরি করছে। ছেলেপুলে পরিবার নিয়ে তার বেশ সুখের জীবন।'

রমেনবাবু বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'তাই নাকি! তা, সেটাই তো জীবনে দরকার। সুখ না থাকলে জীবনে আর কী থাকল! সোনালদিতে কবে আসবে কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'রথযাত্রার আগে আপনার বাড়িতে একটা পুত্র সমাগম যোগ আছে। তবে একটা কথা কর্তা। অভয় দেন তো বলি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো না—'

শশধর চশমার কাঁচ মুছে বলল, 'যোগ যা আছে তা আছে। কিন্তু শুধু যোগে তো কাজ হয় না। তাকে কাজে লাগাতে গেলে কিছু উদ্যোগ আয়োজন করতে হয়।'

'হেঁয়ালি রাখো পণ্ডিত। যা বলার স্পষ্ট করে বলো।'

'আজ্ঞে কর্তা, গাছের আম গাছ তো আর আপনার হাতে দিয়ে যায় না। গাছের ডাল থেকে পাড়তে হয়। আমার কথার গ্যারিন্টি যদি চান তা হলে একটা পুত্রমঙ্গল যজ্ঞ করে ফেলুন। দেখবেন, পরের দিনই ছেলে আপনার বাবা বলে এসে পেন্নাম করবে।'

দু'দিন ধরে চিন্তা করলেন রমেনবাবু। শশধর এ প্রস্তাব আগেও দিয়েছে। তখন তিনি রাজি হননি। কিন্তু এবার পুত্রসমাগম যোগ রয়েছে। এই সময় যজ্ঞটা যদি করে নেওয়া যায় তা হলে হয়তো সত্যিই কাজ হবে।

একটা সুখের মুহূর্ত তৈরি হলো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। টাকার চিন্তা বড়ো হয়ে উঠল। যজ্ঞ করার টাকা পাবেন কোথায়? জমিদার বাড়ির ছেলে বলে জীবনে চাকরি-বাকরি করেননি। ব্যবসাবুদ্ধিও ছিল না। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভেঙে চালিয়েছেন চিরকাল। সুখ-অসুখ, পালা-পার্বণ, বারব্রত থেকে শুরু করে শোভেনের লেখাপড়া পর্যন্ত সবই হয়েছে সঞ্চয় ভেঙে। এখন থাকার মধ্যে আছে বিঘে তিনেক ধানজমি, এই রাজবাড়ি আর ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার টাকা। এ হেন কুবেরের পুঁজি ভাঙলে দুটি প্রাণীর চলে কী করে!

সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে রমেনবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অন্নপূর্ণার কথা মনে পড়ে। আজ সে যদি থাকতো তা হলে পরামর্শ করতে পারতেন। সবাই তাকে এই ধ্বংস্তূপে একলা রেখে কেটে পড়েছে। অভিমানে রমেনবাবুর চোখের পাতা ভিজে গেল।

সন্ধ্যে নামতে আর বিশেষ দেরি নেই। পূর্বদিকের মহলের হেলে পড়া বারান্দার দিকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলেন রমেনবাবু। হঠাৎ কে যেন বলল, 'আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ বাবা? আমি তো তোমাকে ছেড়ে যাইনি। তুমিই আমাকে চলে যেতে বলেছিলে।'

চমকে উঠলেন রমেনবাবু। কে কথা বলল? শোভেন ফিরে এলো নাকি? ঘরের ভেতর পাতলা অন্ধকার। নন্দ বোধহয় বাইরে গেছে। আলো জ্বালা হয়নি। হরিশচন্দ্রের পালঙ্কে বসেই রমেনবাবু হাঁক দিলেন, 'শোভেন এলি? কোথায় তুই বাপ! আমার সামনে আসছিস না কেন?'

কেউ সাড়া দিল না। অন্ধকারে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলেন না রমেনবাবু। শোভেন আসেনি। তিনি ভুল শুনেছেন। এরকম আজকাল হয়। বাস্তব আর কল্পনায় কোনো পার্থক্য থাকে না।

কিন্তু শোভেন না আসুক, যে কথা রমেনবাবু শুনলেন সেটা কি মিথ্যে? শোভেন তো তারই কথায় বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। রমেনবাবু পুবের মহলের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। অন্ধকারে সব ডুবে গেছে।

তিন

রাজবাড়ির ভাঙা বারান্দা অন্ধকারে ডুবে যায় বটে, কিন্তু অতীত ডোবে না। সে তার নিজস্ব আলো জ্বেলে ঠিকই

ভেসে থাকে। অনুশোচনায় দগ্ধ হৃদয় বারবার সেই আলোর সামনে নতজানু হয়।

রমেনবাবু নিজেকে প্রশ্ন করেন, 'আজ আমি এই রাজবাড়ির মতো ধুলো হয়ে গেছি। কিন্তু সেদিনও কী তাই ছিলাম?'

না, সেদিন তিনি অন্যরকম ছিলেন। বিপরীতও বলা যায়। তার জেদ ছিল। অহংকার ছিল। বংশগৌরব ছিল। কিন্তু সাহস ছিল না। সেই মারাত্মক অসংগতি ঢেকে রাখার জন্য তিনি গ্রামের মেঠো রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। রাইফেল কাঁধে নিয়ে শিকারে যেতেন। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করে দিয়েছিল সরকার। সংস্কারের অভাবে রাজবাড়িও একটু একটু করে ভেঙে পড়ছিল। তবুও তিনি বাইরের ঠাঁট বজায় রেখেছিলেন।

প্রায় অচল হতে বসা সংসারটা একার হাতে আগলে রেখেছিলেন অন্নপূর্ণা। না, অলস কর্মবিমুখ স্বামীর পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভেঙে মাছের মুড়ো খাওয়ার প্রতিবাদ তিনি কখনো করেননি। তার স্ত্রী-ধর্মে স্বামী দেবতা। দেবতার অপরাধ উপেক্ষনীয়। স্বাভাবিক ভাবেই শোভেনের লেখাপড়ার জন্য তাকে অনেকবার গয়নার বাক্সে হাত দিতে হয়েছে। শোভেন প্রতিবাদ করলে হেসে বলতেন, 'এত গয়না আমার কী হবে ভানু! ওই সাতনরি হার আর কঙ্কন চারটে থাকলেই হলো। ওগুলো দিয়ে আমি তোর বউয়ের মুখ দেখব।'

শোভেন কিছু বলত না। অন্নপূর্ণা বউয়ের প্রসঙ্গ তুললেই সে মনে মনে একটা মুখের ছবি আঁকত। কৃষ্ণকলি এক তরুণীর মুখ। আয়ত চোখ। কোমর ছাপানো চুল। শরীরের গড়ন খাজুরাহোর যক্ষিণীর মতো। নাম রূপমতী। সাঁওতাল পল্লির মেয়ে রূপমতী। তার অঙ্গে অঙ্গে ঝরনার উচ্ছ্বাস। হাসিতে মহুয়ার নেশা। চুলে করৌঞ্জ ফুলের বুনো গন্ধ। রূপমতীকে ছাড়া অন্য কাউকে বউ করার কথা ভাবতে পারত না শোভেন। অন্নপূর্ণার কথায় সে তার অনাগত সুখের কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকত।

পঁচিশ বছর আগের কথা। সোনালদির পশ্চিম দিকে তখন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এ দিককার লোকে বলে শালোপাড়ার জঙ্গল। শালগাছের প্রাচুর্যের কারণে এরকম নাম হয়ে থাকতে পারে। রমেনবাবুর প্রায়শই শালোপাড়ার জঙ্গলে যেতেন পাখি শিকার করতে। সঙ্গে অ্যাসিসট্যান্ট নন্দ। গাছের ডালে বসা পাখি গুলি খেয়ে মাটিতে পড়লেই রমেনবাবু বলতেন, 'নিরীহ পাখি মারতে আর ভালো লাগে না। বাঘ-ভালুক না মারলে আর কীসের শিকারি।'

নন্দ মনে মনে হাসত। মুখে কিছু বলত না।

রমেনবাবুর মৃগয়াক্ষেত্র ছিল লোনাপানির খাল পর্যন্ত। খাল পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার সাধ্য রমেনবাবুর ছিল না। ওপারে সাঁওতালদের গ্রাম। গ্রামের নাম খালের নামে। লোনাপানি। খালপাড় দাঁড়িয়ে রমেনবাবু বলতেন, 'আর ওদিকে নয় নন্দ। এবার ফিরে চল।'

এই সীমালঙ্ঘন না করার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। সাঁওতালরা সাধারণত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির হয়। লোনাপানির সাঁওতালরাও তাই ছিল। নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় আর প্রভুভক্ত। শাসকের সঙ্গে তারা কোনোদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। দায়ে দরকারে জীবনপণ করে রক্ষা করেছে জমিদারকে। সেইসময় জমিদারদের নিজস্ব লেঠেল বাহিনী থাকত। দুর্বিনীত প্রজাদের মেরে ধরে বাগে আনাই ছিল তাদের কাজ। অনেক সময় আশপাশের অন্য জমিদারদের বাড়িতে ডাকাতির কাজেও ব্যবহার করা হতো লেঠেলদের। তবে সোনালদির লেঠেলদের প্রজাপীড়ন ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিল না।

প্রতাপচন্দ্রের আমলে কাজের পরিধি বাড়ল। প্রতাপচন্দ্র ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমনই লম্পট। বিশটা গ্রাম নিয়ে তার জমিদারি। নিজের জমিদারিতে কোনো সুন্দরী যুবতীর সন্ধান পেলে তার আর রক্ষে ছিল না। লেঠেলরা গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসত। মেয়েটির বাবা, মা, ভাই— যেই বাধা দিক তার গঙ্গাযাত্রা ছিল অবধারিত। তারপর বাবুর শখ মিটে গেলে মেয়েটিরও ঠাঁই হতো লোনাপানির জলে। প্রজাকে মানুষ ভাবার শিক্ষা প্রতাপচন্দ্রের ছিল না। বরং তাদের কীটপতঙ্গের মতো অকিঞ্চিতকর ভেবে তিনি বেশ আমোদ অনুভব করতেন।

সাঁওতাল মেয়েদের ওপর প্রতাপচন্দ্রের নজর প্রথমেই কেন পড়েনি সেকথা বলা মুশকিল। তবে প্রথমে না পড়লেও একসময় পড়ল। আর একবার পড়ার পর পড়তেই থাকল। আনপড় জংলি সাঁওতালদের অনুনয় বিনয় প্রার্থনায় কান দেবার লোক প্রতাপচন্দ্র নন। তিনি জমিদার। প্রজার সঙ্গে তার খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। তিনি ভেবেছিলেন এইভাবেই চলবে। কিন্তু চলল না। কখন সাঁওতালদের চাপা ক্ষোভ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছে, আর কখনই বা কেষ্টঠাকুরের মতো বাঁশি বাজিয়ে ফেরা সাঁওতাল যুবক সনাতন টুডু সেই বিদ্রোহের নায়কে পরিণত হয়েছে— প্রতাপচন্দ্র তার কোনো খবরই রাখতেন না। খবর পেলেন তখন, যখন তার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র বিলাসচন্দ্র অপহৃত হলো। এবং যখন খাস দরবারে এসে সনাতন তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিলাসবাবু আমাদের কাছে আছে বটেক। যদি তুই আমাদের কুনো মেইয়্যাছ্যালের ক্ষতি করিস তা হলে আমরা উয়ারে কেট্টে ভাসায়ে দুবো।'

প্রতাপচন্দ্র একমাত্র সন্তানের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। নিরীহ

সাঁওতালরা যে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে তিনি স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারেননি। বিলাসকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনাই তখন তার প্রধান দায়িত্ব। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন সাঁওতাল মেয়েদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু সনাতন টুডু এবং তার দলবল মুখের কথায় বিশ্বাস করতে রাজি হলো না। তাদের সাফ কথা, অন্তত দু'বছর বিলাস লোনাপানিতে জামিন হিসেবে থাকবে। এর মধ্যে প্রতাপচন্দ্র যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করেন তা হলে সাঁওতালরা বিলাসকে মুক্তি দেবার কথা ভাববে।

দরবারের সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে সনাতন টুডু বিদায় নিল।

সেই রাতেই শালোপাড়ার জঙ্গল মুখর হয়ে উঠল। দশজন বাছাই করা লেঠেল আর চারজন বন্দুকবাজ রওনা দিল লোনাপানির দিকে।

সিদ্ধান্তটা কিছুটা হঠকারী। রাতের জঙ্গলে সাঁওতালদের তিরধনুকের সঙ্গে মাত্র চারটে বন্দুক নিয়ে লড়াই করা বেশ কঠিন। লাঠি এ ক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। প্রতাপচন্দ্র হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। বিলাসচন্দ্রের জন্য দুশ্চিন্তা তো ছিলই। তার সঙ্গে ছিল অপমানের জ্বালা। অজ্ঞাতকূলশীল এক সাঁওতালের বিদ্রোহ তিনি যদি দমন করতে না পরেন, তা হলে রায়চৌধুরীদের মানমর্যাদা বলে আর কিছু থাকবে না। জমিদারি রক্ষা করাই দায় হয়ে উঠবে।

পরিকল্পনা অবশ্য খাটল না। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে চারটে ডিঙি নৌকো ঘাটে এসে লাগতেই ছুটে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে তির। লেঠেলদের সর্দার গণেশ মণ্ডল 'মা গো' বলে পড়ে গেল লোনাপানির জলে। বন্দুকধারীরা গুলি ছুঁড়ল বটে, কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল তারাই জানে। প্রতাপচন্দ্র যে ঝামেলা বাঁধাবেন, সনাতন আগেই বুঝতে পেরেছিল। সে আর তার সঙ্গীরা ডেরা বেঁধেছিল গাছের ডালে। খেলা শেষ করতে তাদের আধঘণ্টাও লাগল না।

পরেরদিন খবরটা হাওয়ার চেয়েও দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রতাপচন্দ্র ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছিলেন। বিলাসকে কী করে ফিরিয়ে আনবেন সেই ভাবনা ছাড়া তিনি অন্য কিছু ভাবতে পারছিলেন না। বৃদ্ধ নায়েব রাধামোহনকে পাঠালেন সনাতনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করার জন্য। কিন্তু সনাতনকে টলানো গেল না। রাধামোহনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সনাতন বলল, 'তু বড়ো ভালো লোক ঠাকুর। তুর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকাইলে জীবনটা ধন্য হইয়ে যায়। কিন্তু উ রাজারে বিশ্বাস লাই। উয়ারে বল্যে দিস, যে কথা কইয়া দিছি তার লড়চড় হবেক লাই। বিলাস জামিন থাইকবেক।'

তখন ব্রিটিশ আমল। আর কোনো উপায় না দেখে প্রতাপচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের শরণাপন্ন হলেন। ম্যাজিসট্রেটের নির্দেশে পুলিশ সুপার মার্টিন হুইটম্যান নিজে এলেন তদন্ত করতে। সনাতনের ভাগ্য ভালো জাতে ব্রিটিশ আর কর্মসূত্রে পুলিশ অফিসার হলেও মার্টিন হুইটম্যান স্বভাবে ছিলেন ভদ্রলোক। না হলে সনাতনের ফাঁসি কেউ ঠেকাতে পারত না। প্রতাপচন্দ্র সেরকম প্রস্তাবই করেছিলেন। শুধু বিলাসকে ফিরে পেলে তার কাজ চলে না। জমিদারের মর্যাদাও ফেরত পাওয়া দরকার। তার জন্য সনাতনের গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়াই সব থেকে ভালো উপায়। কিন্তু প্রতাপচন্দ্রের এক লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে মার্টিন হুইটম্যান বললেন, 'টেন সনাতন উইল বি বর্ন ফলোইং দা ডেথ অব ওয়ান সনাতন। ইউ ওয়ন্ট বি এব্‌ল টু বাই টেন মোর লাইভস বাবু! উতনা রুপেয়া তুমহারে পাশ নেহি হ্যায়। তার চেয়ে হামাকে কাম করিতে দাও।'

সনাতনকে ডেকে পাঠানো হলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারের ডাক উপেক্ষা করা তত সহজ ছিল না। সনাতনও সে দুঃসাহস দেখালো না। মার্টিন হুইটম্যান বললেন, 'হাম তুমহারা পিতা সমান হ্যায়, মাই বয়। কোনো অন্যায় ঘটিলে সোজা হামার কাছে আসিবে। আয়াম আ ক্যাথলিক ক্রিশ্চান। আই সোয়ার ইউ, নাথিং রং উইল হ্যাপেন।'

সনাতন ভাষা বুঝল না বটে, কিন্তু ভাব বুঝল। হুইটম্যান সাহেবের মধ্যস্থতায় স্থির হলো, রায়চৌধুরী বংশের কেউ লোনাপানির খাল পেরিয়ে সাঁওতালদের গ্রামের দিকে যাবে না। নায়েব রাধামোহন যেতে পারবেন। তার হাতেই খাজনা তুলে দেবে সাঁওতালরা।

বাবার হাত ধরে বিলাস ফিরে এলো। কিন্তু জমিদারের ভয়ে বাঘে আর গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার হাড় হিম করে দেওয়া প্রবাদটা আর তত ভয়ঙ্কর থাকল না।

তারপর অনেকগুলো দশক কেটে গেছে। সোনালদি গ্রামের অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার অপরিবর্তনীয় থেকে গেছে। প্রতাপচন্দ্রের পর রায়চৌধুরী বংশের আর কোনো পুরুষ হুইটম্যান সাহেবের টেনে দেওয়া লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে লোনাপানি গ্রামে যাওয়ার সাহস দেখাননি। বস্তুত তারা ছোটবেলা থেকেই একটা ভয়কে সংস্কারের মতো লালন-পালন করতেন। যেন সাঁওতাল পল্লী একটা বর্জিত এলাকা। সেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না। কালক্রমে রায়চৌধুরীদের জমিদারির ভিত আরও দুর্বল হয়েছে। এবং তার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় সংস্কারের ভিত হয়েছে

আরও মজবুত।

সেই মজবুত ভিতে শোভেন প্রথম আঘাত হেনেছিল। কারণ রূপমতী সনাতন টুডুর বংশের মেয়ে। শোভেন তাকে ভালোবাসে জানার পর রূপমতী খোলসা করেই তার পরিচয় দিয়েছিল। শোভেন বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি। যে কোনো মানুষের একটা পারিবারিক অতীত থাকবে। পরিচয়ও থাকবে। এমনই স্বাভাবিক বিশ্বাসে বলেছিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি রূপা। বিয়ে করতে চাই। তাই অতীতকে ভয় করে চলার কোনো দায় আমার নেই।'

বাড়িতে এই সম্পর্কের কথা জানত একমাত্র নন্দ। বেশ কয়েকবার সে শোভেনের দূতের কাজ করেছে। কিন্তু রমেনবাবু বা অন্নপূর্ণাকে বিন্দুবিসর্গ বুঝতে দেয়নি।

তবু রমেনবাবু একদিন জানতে পারলেন। সেদিন খবরের কাগজ নেবেন বলে রমেনবাবু ছেলের ঘরে ঢুকেছিলেন। টেবিলের ওপর একটি মেয়ের পেন্সিল স্কেচ দেখে তার পা আচমকাই থেমে গেল। ছোটবেলা থেকে শোভেনের ছবি আঁকার হাত দারুণ। এই ছবিও তারই আঁকা। কিন্তু মেয়েটি কে? পুরু ঠোঁট আর খোঁপায় করৌঞ্জ ফুলের বাহার দেখে রমেনবাবুর মনে হলো মেয়েটি সাঁওতাল।

শোভেন বাড়িতে ছিল না। ফিরতেই রমেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটি কে ভানু?'

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শোবেন। সম্ভবত আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করল। তারপর আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল। এমনকী, সে যে রূপমতীকে বিয়ে করতে চায় সে কথাও গোপন করল না।

হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন রমেনবাবু। ভয়, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার একটা মিশ্র অনুভূতি তাকে অনেকক্ষণ কথা বলতে দেয়নি। কিন্তু তিনি রমেন রায়চৌধুরী। বিলীন হয়ে যাওয়া অভিজাততন্ত্রের জীবন্ত প্রতিনিধি। চিরকাল মন আর মুখের মধ্যে অপার ব্যবধান রক্ষা করে এসেছেন। অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে উঠেই তিনি রাগে ফেটে পড়েছিলেন, 'তোমার সাহস তো কম নয় ভানু! একটা খুনির বংশের মেয়েকে তুমি এ বাড়ির বউ করতে চাও?'

শোভেন শান্ত সংযত ভঙ্গিতে

বলেছিল, 'আমরা লম্পট বলেই ওরা খুনি বাবা!'

কথাটা তিরের মতো রমেনবাবুর বুকে বিঁধেছিল। মুহূর্তের জন্য তিনি শোভেনের মধ্যে সনাতন টুডুকে দেখতে পেয়েছিলেন। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ প্রবাদ বাক্যটির কথা তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু এ তো প্রহ্লাদের কূলে দৈত্য। বেজায় ভয় পেয়েছিলেন রমেনবাবু। সেদিন আর কোনো কথা বলেননি।

পরেরদিন থেকে শুরু হয়েছিল পাখি পড়ানো। রায়চৌধুরী বংশ বহু প্রাচীন বংশ। স্বয়ং বাদশাহ ঔরঙ্গজেব রায়রায়ান খেতাব দিয়েছিলেন। সেই দলিল এখনও আছে। রূপমতীর কোনো বংশমর্যাদা নেই। অর্ধসভ্য অর্ধশিক্ষিত সমাজে তার জন্ম। সে এই বাড়ির বউ হয়ে এলে লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। ইত্যাদি।

শোভেন শুধু একটা কথাই বলেছিল, 'আমি শুধু মানুষ মানি বাবা। রূপাও আমার কাছে স্রেফ একজন মানুষ। তার বংশমর্যাদা নিয়ে আমি কী করব বলুন তো।'

তিন মাস কেটে গেল, কিন্তু কোনো মীমাংসা হলো না। রমেনবাবু মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করাকে পুরুষত্বের হানি বলে মনে করতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকে অন্নপূর্ণার শরণাপন্ন হতে হলো। রূপমতীর ব্যাপারে এমনিতে অন্নপূর্ণার কোনো আপত্তি ছি না। ছেলে সুখী হলেই তিনি সুখী। কিন্তু গোল বাঁধল স্ত্রী-ধর্মে। তিনি রমেনবাবুর কথাগুলোই ছেলের কাছে উগরে দিলেন। শোভেন অবাক হলো না। এরকম যে হবে সে জানত। প্রতাপচন্দ্র মারা যাবার পর দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। দেশভাগ হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের প্রতি এ বাড়ির পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গী বিন্দুমাত্র বদলায়নি। পুরুষের প্রতি মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গীও থেকে গেছে একই জায়গায়।

অবশেষে রমেনবাবু প্রয়োগ করলেন তার ব্রহ্মাস্ত্র। তিনি ভেবেছিলেন শোভেন বি-এ পাশ করলেও এখনও চাকরি পায়নি। টাকাপয়সার ব্যাপারে ছেলে তার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই একটি পথেই শোভেনকে ফেরানো সম্ভব। একদিন বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি যখন ওই মেয়েটিকে বিয়ে করবেই তখন আমারও একটা কথা তোমার শুনে রাখা দরকার। এ বাড়িতে ওসব হবে না। বিয়ে করতে হয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে করো।'

অন্নপূর্ণা আর্তনাদ করে উঠলেন। কিন্তু রমেনবাবু পাত্তা দিলেন না। তিনি নিশ্চিত ছিলেন আলাদা সংসার পাতার পুঁজি যখন শোভেনের নেই, তখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিয়ে করার ঝুঁকি নিতে পারবে না। কিন্তু তাকে অবাক করে শোভেন বলেছিল, 'ভেবেছিলাম পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার একটা সুযোগ আপনি আমায় দেবেন। কিন্তু আপনি যখন চান না তখন তাই হবে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েই রূপমতীকে বিয়ে করব।'

পরেরদিন একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিল শোভেন। অন্নপূর্ণার কাতর অনুনয় তাকে ফেরাতে পারেনি।

মর্মাহত অন্নপূর্ণা পাঁচ বছর পর তার অসহনীয় স্ত্রী-ধর্ম থেকে মুক্তি পেয়ে বিদায় নেন।

থেকে যান শুধু রমেনবাবু।

চার

ধুলো -ধুলো - ধুলো

রাজবাড়ি ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে ধুলোর নীচে। সময় নিপুণ শিল্পীর মতো মুছে দিচ্ছে সব পাপ। জড়ো হওয়া অতীতের জঞ্জাল বাতাসের আঘাতে ছড়িয়ে পড়ছে দিকদিগন্তে।

রমেনবাবু নাকে একটা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে নিলেন। এই ধুলো যদি বুকের ভেতর সেঁধিয়ে যায় তাহলে কাশতে কাশতে দম বেরিয়ে যাবে। তারপর হয়তো হাঁপের টান উঠে তাকে ঠেসে ধরবে বিছানায়। আজকাল অসুখের ভাবনায় কাবু হয়ে পড়েন রমেনবাবু। মনের মধ্যে ভয় খলবল করে ওঠে। ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে তিনি আর কতদিন এই ভয়ঙ্কর অসুখের মোকাবিলা করবেন? এরপর যখন টান উঠবে তখন যদি বুকের সব কলকব্জা খারাপ হয়ে যায়। জোর করে শোভেনের মুখটা মনে করার চেষ্টা করলেন রমেনবাবু। এটা একটা ওষুধ। শোভেনের মুখ বাতাসে ভেসে উঠলেই ভয় কেটে যায়। বিশ্বাস ফিরে আসে। শোভেন আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। রমেনবাবু ছেলের হাত ধরে বলবেন, 'অনেক কষ্ট পেয়েছি বাপ! এবার আমায় ক্ষমা করে দে।'

দেখতে দেখতে কাপড়টা ধুলোয় ভরে গেল। এ ভাবে হবে না। রমেনবাবু হাঁক পাড়লেন, 'নন্দ! অ্যাই নন্দ! জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে যা।'

নন্দ ব্যস্ত ছিল। আজ শনিবার। আজই নাকি পুত্রমঙ্গল যজ্ঞ করার সেরা দিন। পাঁজি দেখিয়ে বুঝিয়ে গেছে শশধর পণ্ডিত। কালকেই যজ্ঞের বাজার করে এনেছে নন্দ। এখন সেসব গুছিয়ে রাখছিল। এক ধাক্কায় সাতশো টাকা গচ্চা গেছে বলে মেজাজ একটু তিরিক্ষে। জানালা বন্ধ করে বলল, 'যজ্ঞই যখন করবেন তখন কলকাতার কোনো ভালো পণ্ডিতকে বললে পারতেন।'

রমেনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন, আমাদের পণ্ডিত খারাপ কীসে?'

'ভালো খারাপ বুঝি না। তবে এতদিন ধরে টাকা নিয়ে কাজ তো কিছু করতে পারেনি।'

'একদম বাজে কথা বলবি না হারামজাদা। টাকা নেয় তো কী হয়েছে? ও যখন বলেছে শোভেন ফিরবে, তখন ফিরবেই।'

নন্দ কিছু বলল না। বয়স যত বাড়ছে রমেনবাবু ততই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছেন। এমন একজন মানুষকে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো অসম্ভব।

শশধর পণ্ডিত এলো ঠিক দশটার সময়। রমেনবাবু বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠ গুণছিলেন। মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে শশধর বলল, 'পেন্নাম হই কর্তা। সব কুশলমঙ্গল তো?'

কী হলো কে জানে। রমেনবাবু আচমকা বলে ফেললেন, 'বড্ড ধুলো পণ্ডিত। কী করা যায় বলো তো?'

শশধর ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে গেল।

রমেনবাবুর ঘরেই যজ্ঞ হবে। ঘরটা ছোট। হরিশ্চন্দ্রের বিয়ে পালঙ্ক আর মেহগনি কাঠের একটা পেল্লাই আলমারির জন্য আরও ছোট দেখায়। অপরিসর মেঝেতে নন্দ যজ্ঞের সব জিনিসপত্র এনে রাখল। নিজের হাতে সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে যজ্ঞ শুরু করল শশধর। প্রথমে যজ্ঞপতির আবাহন। এই যজ্ঞের অধিপতি স্বয়ং মহাদেব। তাকে তুষ্ট করতে চেষ্টার ত্রুটি করল না শশধর। তার সামনের পাটির ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে এলিয়ে পড়া সংস্কৃত উচ্চারণ শুনে মনে মনে তারিফ করলেন রমেনবাবু। ভাবলেন, যোগ্য ঋত্বিকের হাতেই যজ্ঞের ভার অর্পণ করেছেন। আগেকার কাল হলে মোটা পারিতোষিক দিতেন। এখন আর সেটা সম্ভব নয় বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রমেনবাবু।

ওদিকে যজ্ঞের শেষ লগ্নে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শশধর অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে প্রদক্ষিণ শুরু করল। রমেনবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'ও কী করছ পণ্ডিত!'

'আজ্ঞে, মহাদেবের চারপাশে বাঁধন দিচ্ছি।'

রমেনবাবুর বিস্ময় আরও বাড়ল, 'বাঁধন দিচ্ছ! মহাদেবকে? উনি কী বাঁধা পড়বেন?'

'আজ্ঞে, পড়বেন। এক মাসের মধ্যে আপনার ছেলেকে ফিরিয়েও আনবেন। এই মাত্তর কথা হলো কি না।'

আড়াইশো টাকা দক্ষিণা নিয়ে শশধর বিদায় নিল।

একমাস। মানে তিরিশ দিন। রমেনবাবুর মনে দারুণ ফুর্তি। এই ক'টা দিন তিনি হেসেখেলে কাটিয়ে দেবেন। শশধর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এক মাসের মধ্যে মহাদেব শোভেনকে ফিরিয়ে আনবেন। একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ চাইলে কী না করতে পারে! এমনকী মহাদেবের সঙ্গে কথাও বলতে পারে।

শশধরকে অবিশ্বাস করেন না রমেনবাবু। শোভেনের ফিরে আসার কথায় সায় দিলে কাউকেই অবিশ্বাস করেন না। যে ছেলে পঁচিশ বছরে একবারও বাবার খোঁজ নেয়নি, একটা চিঠি পর্যন্ত কখনো লেখেনি— সে কোথায় আছে, কেমন আছে, আদৌ বেঁচে আছে কিনা!... এসব প্রশ্ন রমেনবাবুর মাথায় আসে না। অনুশোচনা যত তাকে জীর্ণ করে তিনি ততই শোভেনের ফিরে আসার কল্পনাকে আঁকড়ে ধরেন। তার অপরাধী মন সন্তানের কাছে ক্ষমাভিক্ষার জন্য গুমরে ওঠে। ঝাপসা হয়ে যায় দুচোখ। ধুলো হয়ে যেতে থাকা শোভেনের মুখটা বুকে টেনে নিয়ে আচম্বিতে বলে ওঠেন, 'আর যে পারি না বাপ! একবার আয়। আমায় মুক্তি দিয়ে যা।'

তবে আর কোনো চিন্তা নেই। বাঁধা পড়েছেন মহাদেব। তিনি কথা দিলে যে কথার নড়চড় হবার তো নেই।

আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টি এখনও নামেনি বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নামবে। নন্দ গিয়েছিল মাঠে। বিঘে তিনেক ধানজমি এখনও বেঁচেবর্তে আছে বলে সারা বছরের খোরাকিটা জুটে যায়। না থাকলে কী হতো ভগবানই জানেন। মাঠ থেকে ফেরার সময় ছুইমুদ্দির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সাইকেল থেকে নেমে ছুইমুদ্দি বলল, 'ছালাম আলেকুম নন্দদা। খবর সব ভালো তো?'

'চলে যাচ্ছে রে। তোরা কেমন আছিস?'

'ব্যাস আল্লার মেহেরবানি। রাজাবাবু কেমন আছেন?'

'ভালো আছেন।'

ছুইমুদ্দি উদাস গলায় বলল, 'বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন গো। আল্লা যদি নিয়ে নেন মানুষটা বেঁচে যায়।'

হাওয়ার ঝাপটায় নন্দ টাল খেল। চোখ তুলে চেয়ে দেখল মেঘের ভারে ঝুলে পড়েছে আকাশ। চঞ্চল হয়ে উঠল নন্দ। উদাস ছুইমুদ্দিকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে হনহন করে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে।

আসলে নন্দ পালিয়ে গেল ছুইমদ্দির কাছ থেকে। রমেনবাবুর মৃত্যুর কথা শুনলে তার ভয় করে। রমেনবাবু তার ছাদ। তার দেওয়াল। তার শেকড়। নন্দর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নেই। আত্মীয়-স্বজন নেই। বন্ধু নেই। থাকার মধ্যে আছে এক রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। আর আছেন রাজ্যহীন নিঃসঙ্গ এক রাজা।

সোনাপাড়ার মোড়ে বৃষ্টি নামল। বানডাকানো বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে উলোঝুলো হয়ে গেল চারপাশ। নন্দর মনে হলো, সে বোধহয় আর কখনও রাজবাড়িতে ফিরতে পারবে না। তাকে দেখতে না পেয়ে রাজাবাবু... ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল নন্দ।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি একটু কমল। ততক্ষণে নন্দ নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে। মুখে বোকা বোকা হাসি। ছুইমুদ্দির কথা শুনে মাথাটা হঠাৎ পাগলাটে হয়ে গিয়েছিল। তার কাছেও যে অস্ত্রশস্ত্র আছে সে কথা মনেও

পড়েনি। এবার থেকে সে আরও ভালো ডাক্তারি করবে। শোভেনদাকে এমন জীবন্ত করে দেবে যে নন্দ নিজেই মিথ্যেটা ধরতে পারবে না। কার বুকের পাটা আছে রাজাবাবুকে নিয়ে যাক তো দেখি!

পাঁচ

অমাবস্যার দিন সোনালদিতে সাজো সাজো রব পড়ে যায়। এমনিতে এ তল্লাটে দেখার কিছু নেই। আছেন শুধু মা ভবতারিণী। প্রত্যেক অমাবস্যায় ধুমধাম করে মায়ের পুজো হয়। মেলা বসে। রায়চৌধুরীদের আদিপুরুষ সদাশিবচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তন্ত্রাচার্য কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী ছিলেন প্রথম সেবায়েত। এখনকার সেবায়েত রামতারক তারই বংশধর।

আজ অমাবস্যা।

নন্দ ঘরে ঢুকে দেখল রমেনবাবু আলমারি খুলে শোভেনের পুরনো জামাকাপড় ঘাঁটছেন। বিরক্ত হলো সে। এই এক নতুন বাতিক হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বলেন, 'আমায় খাট থেকে নামিয়ে দে।' তারপর আলমারি খুলে জামাকাপড় ঘাঁটতে বসে যান। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'শোভেন এসে কী পরবে আগে থাকতে ঠিক করে রাখতে হবে না?'

মুশকিল হলো নন্দ ডাক্তারি করে অসুখ সারাতে পারে কিন্তু বাতিক সারাতে পারে না।

গলা খাঁকারি দিয়ে নন্দ বলল, 'বলছিলুম কী আজ তো অমাবস্যা। বাড়ি থেকে সিধে যাবে তো না কি?'

আগে মন্দিরের খরচপত্তরও রাজবাড়ি থেকেই যেত। পুজোর সময় রাজা উপস্থিত থাকতেন। প্রতাপচন্দ্র থেকে হরিশ্চন্দ্র— সবাই নিজের হাতে পাঁঠা বলি দিতেন বলে শোনা যায়। সেসব দিন আর নেই। তাও অন্নপূর্ণা যতদিন ছিলেন মায়ের আলতা সিঁদুর আর একটা ভালো শাড়ি পাঠাতেন। রমেনবাবুর আমলে শুধু সিধে যায়।

জামাকাপড় সরিয়ে রমেনবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'সেটা কি ঠিক হবে নন্দ? এখন তো মহাদেবের আশ্রয়ে আছি, ভবতারিণীকে সিধে পাঠালে তিনি যদি রেগে যান?'

'সে আবার কী কথা! মহাদেব আর ভবতারিণী আলাদা নাকি?'

'আলাদা নয় বলছিস? বেশ তবে দিয়ে আয় সিধে। আর বেটিকে একটু বলিস, বড্ড ধুলো। ধুলোয় আমার কষ্ট হয়।'

সন্ধ্যে হতেই বেরিয়ে পড়ল নন্দ। পুজো দ্বিতীয় প্রহরে। নন্দ তখন থাকতে পারবে না। এখন রামতারক চক্রবর্তীর জিরেনের সময়। নন্দ একান্তে তাকে কিছু বলতে চায়।

সেদিন বৃষ্টির মধ্যে মাথাটা ধাঁধিয়ে যাবার পর থেকেই কথাটা নন্দর মনে হচ্ছে। ছুইমুদ্দির আগে কত লোকই তো রমেনবাবুর রোগভোগের কথা বলেছে। মরণ হলে মানুষটা যে মুক্তি পাবে সে কথাও তো নতুন কিছু নয়। সেসব কথায় ভয় নন্দ অবশ্যই পেয়েছে। তেমন তেমন লোক হলে আগ বাড়িয়ে ঝগড়াও করেছে। কিন্তু সেদিনের মতো ভেঙে পড়েনি। ধাঁধিয়ে যায়নি তার ইহকাল-পরকাল। এর কারণও বের করে ফেলেছে নন্দ। বয়স যত বাড়ছে তার আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে। তার মন একটা মিথ্যেকে আর সত্যি ভাবতে পারছে না। বানানো সত্যের জায়গায় দিনদিন প্রখর হয়ে উঠছে প্রকৃত সত্য। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সত্য। কোথায় যাবে সে? শেষ জীবনটা কি ভবতারিণী মন্দিরের চাতালে বসে ভিক্ষে করে কাটবে?

না, তা হতে পারে না। নন্দ মনে মনে চিন্তা করল। তার শক্তি চাই। মিথ্যেকে সত্যি বানাবার শক্তি। তাকে ডাক্তারি করতে হবে। শোভেনের ফিরে আসার কল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আরও অনেকদিন, অনেক বছর রমেনবাবুকে মাতাল করে রাখতে হবে।

রামতারক তান্ত্রিক মানুষ। কত গুহ্যবিদ্যা জানেন। নন্দর ধারণা, তার পায়ে একবার কেঁদে পড়লে তিনি তাকে ফেরাবেন না। তিনি আশীর্বাদ করলেই নন্দর মন আবার তরতাজা হয়ে উঠবে।

মন্দিরের চাতালে ম্যারাপ বাঁধা। বর্ষাকাল বলে এই ব্যবস্থা। রাত একটু বাড়লে ভক্তরা আসতে শুরু করবে। মায়ের পুজোর সময় চাতালে এত ভিড় হয় যে তিলধারণের জায়গা থাকে না।

ভিখু গয়লানি চাতালে ঝাঁট দিচ্ছিল। ওকে দেখে নন্দর মনটা উদাস হয়ে গেল। কত বয়েস হবে ভিখুর? চল্লিশ-বিয়াল্লিশ তো বটেই। শরীরের গড়ন এখনও বেশ ভরাট। ছেলেবেলায় শোভেনদা যখন ঘোড়ায় চড়ে কোশাকুশির মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যেত, নন্দ বসে থাকত গাছের নীচে। অপেক্ষা করত শোভেনদার জন্য। ভিখুর বাবা মদনকাকার বাড়ি ছিল কাছেই। নন্দকে একা বসে থাকতে দেখে ভিখু ছুটে এসে বলত, 'আমার সঙ্গে পুতুল খেলবে নন্দদা?' কতদিন ভিখুর সঙ্গে পুতুল খেলেছে নন্দ। পুতুলের বিয়ে দিয়েছে দু'জনে। পুতুল-কন্যে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর একেবারে আসল বাবা-মা'র মতো দুঃখ পেয়েছে। একটা পরিপূর্ণ সংসারের ছবি সেই বয়সেই ভিখু এঁকে দিয়েছিল। খেলা ভেবে নন্দ ছবিটা তুলে রাখেনি। রোদেজলে সেই ছবি নষ্ট হয়ে গেছে।

এতদিন পর আজ হঠাৎ নন্দর নিজের ওপর করুণা হলো। ভাগ্য করে সে একটা মানবজীবন পেয়েছিল। কিন্তু কিছু করা হলো না।

নন্দ ভেবেছিল ভিখুর সামনে যাবে না। কিন্তু কী এক আশ্চর্য আকর্ষণে চলে গেল। ভিখু তাকে দেখতে পায়নি। নন্দ বলল, 'ভালো আছিস ভিখু?'

ভিখু অকৃত্রিম আনন্দে হেসে বলল, 'ওমা, নন্দদা যে! কদ্দিন পর দেখা হলো। এক গেরামে থাকি কে বলবে!'

নন্দ আবার প্রশ্নটা করল। মুহূর্তের মধ্যে ভিখুর হাসিটা পালটে গেল, 'কী জানি কেমন আছি। তুমি কেমন আছ নন্দদা?'

'বিয়ে করলি না কেন ভিখু?'

ভিখু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নন্দর মুখের দিকে। তারপর মাথা নীচু করে বলল, 'কী জানি কেন করলুম না।'

রামতারক নিজের ঘরে বসে কী একটা বই পড়ছিলেন। মন্দিরের পুরোহিত হলেও নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রামে একটি লাইব্রেরি করেছেন। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়েও পড়াশোনা করেন।

নন্দ ঘরে ঢুকে বলল, 'রাজবাড়ি থেকে সিধে এনেছি তারক ঠাকুর।'

রামতারক বই থেকে মুখ তুলে নন্দকে দেখে বললেন, 'ও তুই! ওই টেবিলে থালাটা রাখ। তারপর, রাজাবাবুর কী খবর?'

'আজ্ঞে ভালোই আছেন।' কথাটা বলেই নন্দ রামতারকের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার বড়ো বিপদ তাকরঠাকুর। দয়া করে একটা উপায় বলে দ্যান।'

রামতারক নন্দকে স্নেহ করেন। গ্রামের আর পাঁচজনের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন, অন্নপূর্ণা মারা যাবার পর নন্দ যেভাবে রমেনবাবুকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু রমেনবাবু যদি ভালো থাকেন তাহলে নন্দ কোন বিপদের কথা বলছে? রামতারক বুঝে উঠতে পারলেন না।— 'আরে হতভাগা পা ছাড়। সব কথা খুলে বল। কী হয়েছে তোর?'

নন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে আরম্ভ করল। এসব কথা সে আগে কখনো কাউকে বলেনি। অবনী ডাক্তার মানা করে, 'খবরদার এ কথা পাঁচকান করিসনি নন্দ। লোকে জানতে পারলেই ব্যাগড়া দেবে। ইহকাল পরকালের বচন ঝাড়বে। একটা মান্যিগন্যি লোককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তুই ক'টা মিথ্যে কথা বলছিস, এতে অন্যায় তো কিছু নেই।'

নন্দও জানে অন্যায় নেই। তবে স্বার্থ আছে। অবনী ডাক্তারের স্বার্থ দু'পয়সা রোজগার। এদিকে নন্দকে দিয়ে ডাক্তারি করায় আর ওদিকে নিজের ডাক্তারখানায় বসে বলে, 'আমার চিকিৎসাতেই তো রাজাবাবু সুস্থ আছেন। কথাটা সত্যি কি না একবার নন্দকেই জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো না।'— এসব কথা শুনে ভিন গাঁ থেকে রুগিরা এসে ভিড় করে। নন্দর কানে সবই আসে। সে রা কাড়ে না। তার নিজের স্বার্থও তো বড়ো কম নয়।

সব কথা বলার পর নন্দ বলল, 'আমার মনের জোর ফিরিয়ে দ্যান তারক ঠাকুর। যাতে আমি আরও ভালোভাবে ডাক্তারি করতে পারি।'

রামতারক হেসে বললেন, 'তুই বুঝি ভাবছিস তোর ডাক্তারির জন্য রাজাবাবু বেঁচে আছেন?'

'আজ্ঞে, অবনীবাবু তো তাই বলেন।'

'মিথ্যে কথা বলে অবনী ডাক্তার। মা রেখেছেন বলে রাজাবাবু আছেন। যেদিন মা টেনে নেবেন সেদিন তোর ডাক্তারি কিস্যু করতে পারবে না।'

এ তল্লাটে রামতারককে সবাই বাকসিদ্ধ বসে মানে। তিনি যা বলেন, তাই ফলে যায়। নন্দ পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কথাও বলতে পারল না।

রামতারক বললেন, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে তোর খুব চিন্তা না রে? ভয় কী! রাজাবাবু যখন থাকবেন না তখন মায়ের মন্দিরে এসে থাকিস। মায়ের কাজ করবি আর দুবেলা প্রসাদ পাবি।'

'জীবন এত সহজ নাকি গো ঠাকুর?' কথাগুলো নন্দ মনে মনে বলল। মুখে কিছু বলতে পারল না। চোখের দৃষ্টি থমকে রইল রামতারকের পায়ে। তার আশ্রয় এত কাছে ছিল সে জানতে পারেনি। জানলে তাকে ডাক্তার সাজতে হতো না। কান্না পাচ্ছিল নন্দর। কষ্ট হচ্ছিল রমেনবাবুর জন্য। তার কষ্ট রমেনবাবুকে মিথ্যে স্তোকবাক্য বলার জন্য নয়। সন্তানকে ভোলাবার জন্য মা তো কতই ছল করেন। কিন্তু সেই ছলনায় যখন স্বার্থ এসে মেশে তখন আর মা হয়ে ওঠা হয় না। নন্দ পারেনি মা হতে। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। রামতারকের পায়ের কাছে বসে বলল, 'এখন আমি কী করব বলে দ্যান।'

রামতারক তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমায় কিছু বলতে হবে না। সময় হলে মা-ই তোকে সব বলে দেবেন।'

ছয়

শশধর পণ্ডিতের দেওয়া এক মাস সময়ের অর্ধেক কেটে গেল। এখনও শোভেনের দেখা নেই। রমেনবাবু দিন-দিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন। উঠতে বসতে নন্দকে গালাগাল দেন। নন্দ বিশেষ সাড়াশব্দ করে না। মুখ বুজে কাজ করে যায়। আগেও সে বেশি কথা বলত না, সেদিন মন্দির থেকে ঘুরে আসার পর থেকে আরও চুপচাপ হয়ে গেছে। ফাঁক পেলেই ভবিষ্যতের ভাবনায় তলিয়ে যায়। তারক ঠাকুর তাকে মায়ের কাজ করার কথা বলেছেন, কিন্তু কী কাজ বলেননি। মন্দিরে কত কাজই তো থাকে। বাজারহাট, রান্নাবান্না, বাসনপত্তর মাজাধোওয়া— ভাবতে ভাবতে নন্দর

মন ঘুরে যায় ভিখুর দিকে। আর ঠিক তখনই ধুলোয় ভরে যাওয়া তার মনের আনাচেকানাচে মাথা তোলে দু-একটা কচি চারা। সবুজ পাতারা হাওয়ায় দোল খায়। ফুল ফোটে। নন্দ মুখ ফিরিয়ে নিতে চায় কিন্তু পারে না। স্পষ্ট শুনতে পায়, ভিখুর গলা, 'আমার সঙ্গে পুতুল খেলবে নন্দদা?' আধবুড়ো নন্দ ফিসফিস করে বলে, 'খেলব'।

শ্রাবণ মাস পড়তেই নন্দর নির্নিমেষ প্রশান্তিতে বাধা পড়ল। টানা চারদিন উথালপাতাল বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কত মাটির ঘর যে ভেঙে পড়ল আর কত টিনের চাল যে উড়ে গেল তার ঠিক নেই। রাজবাড়ির অবস্থাও খুব খারাপ। নোনা ধরা দেওয়ালে জলের দাগ। জানলার পাল্লার ফাঁকফোকরে বৃষ্টি ছাঁট। রমেনবাবুর ঘরে দু'দণ্ড দাঁড়ালে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বিপদ আঁচ করে নন্দ কম্বল বের করল। গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে রমেনবাবু বললেন, 'এটা ভালো করেছিস। বড্ড শীত করছিল।'

নন্দ কিছু না বলে চলেই আসছিল, রমেনবাবু ডাকলেন, 'নন্দ। তুইও কি আমার মতো চতুর্দিকে ধুলো দেখছিস?'

দীর্ঘদিনের অভ্যেসবশত নন্দ ডাক্তারি শুরু করতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। রামতারক তাকে ডাক্তারি করতে বারণ করেছেন। মা ভবতারিণীর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন। সে তাই করবে। রমেনবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে নন্দ বলল, 'কোথাও তো ধুলো নেই বাবু। ওসব আপনার মনের ভুল। ঘুমিয়ে পড়ুন দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রমেনবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু নন্দর চোখে ঘুম এলো না। মাথায় দুশ্চিন্তার পাহাড়। রমেনবাবু অসুখে পড়বেনই। তখন সে কী করবে? চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? সহ্য করতে পারবে মানুষটার কষ্ট? বিদ্রোহ করে উঠল নন্দর মন, 'তা হয় না। আমি পারব না ঠাকুর। একটা বাপ-মা মরা অনাথ ছেলেকে ওই মানুষটা আশ্রয় দিয়েছিল। মা বলত, শোভেন আমার বড়ো আর তুই ছোট। মায়ের জন্য কিছু করতে পারিনি কিন্তু ওই বুড়ো লোকটা যদি আমার ক'টা মিছে কথা শুনে চাঙ্গা হয়, তাতে দোষ কী ঠাকুর।'

দোষগুণের বিচার হলো না। নন্দও কিছুক্ষণ পর অনুভব করল তার বিদ্রোহী মন কখন যেন শান্ত হয়ে গেছে। বিশ্বাসের সেই জোর নেই। উৎসাহ নেই। মন যেন বলতে চায়, 'মিছে কথা বলে কাজ নেই। তারক ঠাকুরের কথাই ঠিক। বাবুর আয়ু আছে বলেই এখনও টিঁকে আছেন। তোমার ডাক্তারিতে বাবু সেরে যায়, এসব তোমার অহঙ্কার।' নন্দ জোর করে বলতে চাইল, 'একটা মানুষ যদি সুস্থ হয়ে ওঠে তো অহঙ্কারই সই।' কিন্তু বলা হলো না। চোখের সামনে ভিখুর সুন্দর মুখটা দেখে নন্দর কথা আটকে গেল।

নন্দর অনুমান মিথ্যে নয়। পরের দিনই রমেনবাবু অসুখে পড়লেন। প্রবল কাশি আর হাঁপের টান। এই দুই শত্রুর সঙ্গে নন্দর পরিচয় আছে। কিন্তু এবার রমেনবাবু জ্বরও বাধিয়ে বসলেন। গায়ে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় এমন জ্বর।

অবনী ডাক্তার রুগি দেখে দায়সারা ভাবে বলল, 'ওষুধে আর রাজাবাবুর কাজ হবে না। যা করার তোকেই করতে হবে।'

'তা হয় না ডাক্তারবাবু। আপনি যদি না পারেন আমাকে তাহলে সদরে বড়ো ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে।'

গেঁয়ো অশিক্ষিত একটা চাকরের কাছে অবনী ডাক্তার এই জবাব আশা করেনি। তার চেয়েও বড়ো কথা, রমেনবাবুর নাম ব্যবহার করে সে বিস্তর রোজগার করেছে। এখন যদি সদরের ডাক্তার এসে গুড় খেয়ে বেরিয়ে যায়, ভিন গাঁয়ের লোক আর তাকে মানবে না। সম্ভাব্য লোকসানের কথা চিন্তা করে অবনী ডাক্তার হেসে বলে, 'আহা আমি পারব না সেকথা কখন বললুম। সর, দেখি কী করতে পারি।'

রমেনবাবুর জ্ঞান নেই। কথা আছে না নেই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অবনী ডাক্তার নতুন প্রেসক্রিপশন লিখল। যাবার সময় বলে গেল, 'ওষুধগুলো এখনই নিয়ে এসে খাওয়াতে শুরু কর। আর কাত্তিকের ওষুধের দোকানে আমি বলে দিচ্ছি, একটু পর গিয়ে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আসবি। দুগ্গা, দুগ্গা।'

সিলিন্ডার এলো। নন্দ এসব জানে। হাওয়ার কল খুলে যত্ন করে রমেনবাবুর নাকে লাগিয়ে দিল নলদুটো। তারপর বুকে কান ঠেকালো। হ্যাঁ, ধুকপুক করে চলছে বটে হৃদয়টা। একটু আগেও রমেনবাবু খাবি খাচ্ছিলেন। বিদঘুটে ঘড়ঘড় শব্দটা শুনতে শুনতে নন্দ ভাবছিল, মানুষ তার শরীরে জল ধরে রাখতে পারে, খাবার ধরে রাখতে পারে, কিন্তু হাওয়া কেন পারে না। এখন আর সেই ঘড়ঘড় শব্দটা নেই। ঘরের ভেতর কোনো শব্দই নেই। বাইরে শুধু ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ।

দু'দিন পর রমেনবাবু কথা বললেন। নন্দ রুটি সেঁকছিল। হঠাৎ কানে এলো রমেনবাবুর গলা, 'তোমাকে তো বললুম শোভেনের হাতে জল না খেয়ে আমি কোথাও যাব না। তুমি এখন যাও বড়ো বউ।'

চমকে উঠল নন্দ। উনুন থেকে চাটুটা নামিয়ে ঘরে গিয়ে দেখল রমেনবাবুর চোখ বন্ধ। কিন্তু ঠোঁট নড়ছে। তিনি জড়িয়েমড়িয়ে একই কথা বলে চলেছেন। নন্দ কপালে হাত দিয়ে জ্বর

দেখল। জ্বর এখনও আছে। তবে কলের হাওয়ার গুণে শ্বাসকষ্টটা নেই। কিন্তু জ্বর যদি আরও বাড়ে? এত রাতে নন্দ কার কাছে যাবে? অবনী ডাক্তার শ্বশুরবাড়ি গেছে। ফিরবে পরশু। ভয়ে নন্দর মুখ শুকিয়ে গেল। রমেনবাবুর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'বাবু! ও বাবু! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

'কে? কে রে?'

'আজ্ঞে, আমি নন্দ।'

'তুইও বুঝি আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিস? শালা তোকে বলিনি, আমি কোথাও যাব না।'

নন্দ কান্না চেপে বলল, 'আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আপনি এখানেই থাকবেন।'

রমেনবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'তা হলে যা। শোভেন তার ঘরে আছে। ওকে পাঠিয়ে দে। গিয়ে বল, বুড়ো বাপ ক্ষমা চাইবে বলে বসে আছে। ওর ক্ষমাই যে আমার গঙ্গাজল!'

নিজের ঘরে এসে নন্দ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। এখন সে কী করবে? কোথা থেকে নিয়ে আসবে শোভেনকে? শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'বাবুকে আর কষ্ট দিসনি মা। সময় যদি হয়ে গিয়ে থাকে এবার নিয়ে নে।'

রাত বাড়তে থাকল। রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল রমেনবাবুর বিলাপ। ছেলের কান্না শুনে বললেন, 'রেলগাড়ি ভেঙে গেছে তো কী হয়েছে গোপাল! আবার আমি কিনে দেব।' ছেলে ঘুমের মধ্যে রূপকথার রাক্ষসকে দেখে ভয় পেয়েছে। রমেনবাবু বললেন, 'রাজপুত্র আবার কাঁদে নাকি! সে তো তলোয়ারের এক কোপে রাক্ষসের গলা কেটে ফেলবে।'

রমেনবাবুর কথা ভালো বোঝা যায় না। তবুও নন্দ কান খাড়া করে রইল। যদি ঘোর কাটে। যদি রমেনবাবু তাকে ডাকেন। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। নন্দর মনে হলো, আর কোনো ঘটনা ঘটবে না। রমেনবাবুর জীবনের ঘটনাস্রোত থেমে গেছে। শেষ বাঁধনটা যদি কেউ খুলে দেয় তা হলে খড়ির দাগ বোধহয় আজ রাতেই মুছে যাবে।

ঘরের ভেতর অন্ধকার নিশ্চল হয়ে

দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। রমেনবাবুর চেতনা পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। ধুলোয় ঢাকা একটা পর্দা পেন্ডুলামের মতো দুলছে। হালকা হলুদ একটা আলো। সনাতন টুডুর অট্টহাসি। রূপমতীর প্রেম! শোভেনের গৃহত্যাগ। রমেনবাবুর ঠোঁট নড়ে উঠল, 'একবার আয় না বাপ। তুই না এলে আমি কেমন করে যাই!'

এই মিনতি রমেনবাবু অনেকবার করেছেন। কেউ সাড়া দেয়নি। কিন্তু এবার ঘরের নিশ্চল অন্ধকারে কীভাবে যেন মৃদু সাড়া পড়ল। দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। জানলার ফাঁক দিয়ে আচমকা ঢুকে পড়া ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিভে গেল লণ্ঠনের শিখা। আর ঠিক তখনই রমেনবাবুর কানে আছড়ে পড়ল ছোট্ট একটা ডাক, 'বাবা!'

রমেনবাবু রুগ্ন। দুর্বল। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। ডাক একটা শুনেছেন কিন্তু কার ডাক বোঝেননি। ভাবলেন, মরণ কি জীবনকে বাবা বলে ডাকে? কে জানে মরণ জীবনের সন্তান কি না! চারপাশটা এমন হলুদ হয়ে গেল কী করে? হলুদের ওপারে ওই যে তোরণ দেখা যায়, ওটাই কি স্বর্গ? 'একবার ছেলেটাকে দেখতে চেয়েছিলুম। তাও দিলে না ঠাকুর?'

'বাবা, আমি শোভেন।'

রমেনবাবু যেন ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠলেন। হলুদ পৃথিবীটা দপ্ করে নিভে গেল। অনন্ত অন্ধকারে ভাসতে ভাসতে বললেন, 'কে? সনাতন? তোমাদের মেয়েকে আমার ছেলে ভালোবাসে সনাতন। ওকে মেরো না।'

'আমি সনাতন নয় বাবা। শোভেন। আপনার ভানু।'

'ভানু এইচিস? এত দেরি করলি কেন বাপ?'

'আজ সকালেই খবর পেলাম। তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'আমাকে ক্ষমা করেছিস তো? বুড়ো বাপের অপরাধ মনে রাখতে নেই সোনা। এবারকার মতো ক্ষমা করে দে।'

'কীসের ক্ষমা বাবা! আপনার তো কোনো দোষ ছিল না। ভাগ্যের দোষে যা হবার হয়েছে।'

রমেনবাবুর চেতনা আবার দিশা হারাল। শুধু শোভেনের ক্ষমার জন্য রমেনবাবুর চেতনা বাসায় ফিরেছিল। সারা জীবনের তপস্যার ফসলে নৌকো বোঝাই হওয়া মাত্র নোঙর উঠল। রমেনবাবু স্খলিত স্বরে বলে উঠলেন, 'আমি এমন ধুলো হয়ে যাচ্ছি কেন রে ভানু! আমাকে ধর তুই। ধরে রাখ।'

শোভেন হাত বাড়াবার আগেই রমেনবাবু বিদায় নিলেন।

সকাল হলো। ভোজবাজির মতো দুর্যোগও কেটে গেল। নন্দ এতক্ষণ রমেনবাবুর পায়ের কাছে বসেছিল। তার মন পাথর। মাথাটা ফাঁকা। সে নিবিষ্ট মনে একটা মাছির দিকে তাকিয়ে আছে। মাছিটা রমেনবাবুর খোলা মুখগহ্বরের চারপাশে উড়ছে। মাঝে মাঝে বসছে ঠোঁটের ওপর। আবার উড়ছে।

কিন্তু হঠাৎ একসময় মাছিটাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। আর ঠিক তখনই নন্দর মনে হলো কেউ কি তার কথা বিশ্বাস করবে? বিশেষ করে রামতারকের কথা চিন্তা করে সে অস্থির হয়ে উঠল। রামতারককে সে কথা দিয়েছিল ডাক্তারি করবে না। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে আর কোনো প্রতারণা করবে না। কিন্তু রমেনবাবুর কষ্ট সে সহ্য করতে পারেনি। তাই কথাও রাখতে পারেনি।

নন্দ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। শোভেনের পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাক পরে নিল। তারপর রমেনবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাল শোভেনদা আসেনি বাবু। আমিই শোভেনদা সেজেছিলাম। আমারই মিছিমিছি ক্ষমায় খুশি হয়ে আপনি সগগে গেছেন। তার জন্য যে শাস্তি আমার পাওনা হয় দ্যান। যদি আপনার থেকেও আমার কষ্টের মরণ হয় তো তাই সই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এবার অন্তত আমি নিজের স্বার্থে আপনাকে ঠকাইনি। আপনার কষ্ট সইতে পারিনি বলে বাঁধন খুলে দিয়েছি।'

বেলা একটু বাড়লে নন্দ বাইরে বেরিয়ে একজনকে বলল, 'কাল রাতে রাজাবাবু মারা গেছেন। গাঁয়ের সবাইকে খবরটা একটু দাও তো ভাই।'

লোকটা পড়ি কি মরি হয়ে গ্রামের দিকে ছুটল।

খোলা আকাশের দিকে তাকাল নন্দ। একটা মুখ খোঁজার চেষ্টা করল। ভিখুর মুখ। ঝলমল করে উঠল ভিখু। দু'দিন আগেও ভিখুর কথা ভেবে, রামতারকের দেওয়া আশ্রয়ের কথা ভেবে নন্দ কত খুশি হয়েছে। কিন্তু আজ এই মন কেমন করা সকালে আকাশে ভিখুর মুখ দেখে তার কিছু মনেই হলো না। যেন ভিখুকে সে চেনেই না। যেন ভিখুর কথা ভেবে এই বুড়ো বয়সে ঘরদুয়ারের স্বপ্ন সে দেখেইনি।

অবাক হলো নন্দ। আকাশের ভিখুর দিকে ছড়িয়ে দিল দু'হাত। হাত কোথাও পৌঁছলো না। নতুন এক ভয় ঘিরে ধরল নন্দকে। সে ঠগ। প্রতারক। যদি সে ভিখুর ওপরেও ডাক্তারি করে ফেলে? যদি ধুলোয় ধুলোয় ভরে দেয় ভিখুর চোখ? যদি মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে ভিখুকেও বেঁধে ফেলে কোনো অবান্তর প্রতিজ্ঞায়? বড্ড কষ্ট পাবে ভিখু। স্বর্গের ডাক আসবে, কিন্তু নরক ছেড়ে যেতে পারবে না। নন্দ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা হয় না রে ভিখু। পুতুলখেলা আমার ভাগ্যে নেই। থাকলে ঠিক খেলতুম।'

কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা সোনালদি গ্রাম ভেঙে পড়ল রাজবাড়ির সামনে। কিন্তু নন্দকে কোথাও দেখা গেল না। ■

এক যোদ্ধা সন্ন্যাসী

বিজয় আঢ্য

মাননীয় মন্টুদা,

আমি উত্তরকাশী যাচ্ছি। কখন ফিরব জানি না। আপনাদের পরিচালনায় কল্যাণ আশ্রমের কাজের শ্রীবৃদ্ধি হোক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই।

— নবকুমার সরকার

এক-দু লাইনের ছোট্ট চিঠি। চিঠিটা পড়ে বলরামদার চোখের কোণ দুটো চিক্ চিক্ করে উঠল।

১৯৭৮ সাল। তখন পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ সদ্য শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক শ্রদ্ধেয় বসন্তরাও ভট্ট তখন এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় এই বছরে নবকুমার সরকার পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি প্রকল্পের কাজে যোগ দেন। বাগমুণ্ডি ব্লকের অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামের চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিয়ে একটা ছাত্রাবাস গড়ে তোলা হয়েছে। তবে আর পাঁচটা ছাত্রাবাসের মতো এটা নয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের পড়াশোনা ছাড়াও এখানে রয়েছে শারীরিক শিক্ষা, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও নৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা। এই কাজের জন্য চাই অনুভবী ও শিক্ষিত যুবক। যাঁরা এই কাজকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবেন। বাগমুণ্ডিতে

এই কাজে এগিয়ে এলেন প্রথমে দু'জন যুবক— নবকুমার সরকার ও বর্ধমানের মদন মিত্র। মাস চারেক পর তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন বাঁকুড়ার বড়জোড়ার বলরাম সাঁতরা মানে মন্টুদা।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার হরিণখোলা নদীর ধারে ভুঁয়েড়া গ্রাম। ১৯৫১ সালের ১১ নভেম্বরে এই গ্রামেই নবকুমারের জন্ম। বাবা গান্ধী অনুরাগী স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ সরকার। মা প্রমীলা দেবী। মা-র বয়স এখন প্রায় নব্বই ছুঁই ছুঁই। বিভূতিবাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরামবাগের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বি কে রায়ের ফার্মে তিনি চাকরি করতেন। বদলির চাকরি। তাই কখনো কোলাঘাট, কখনো তারকেশ্বর, কখনো বা আরামবাগ। শেষমেষ বালিবেলা গ্রাম হয়ে কামারপুকুর। সাত ভাই। সাত ভাইয়ের মধ্যে নবকুমার দ্বিতীয়। বড়ো ভাই সুকুমার সরকার একসময় সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। কোলাঘাট ইউনিয়ন হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা; সেসময় সাইকেল চালাতে গিয়ে পড়ে গেলে নবকুমারের বাম হাতটা ভেঙে যায়, সেই হাত এখনও ঠিক সোজা হয়নি। এরপর কালীপুর স্বামীজী হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক, কামারপুকুর কলেজ ও পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় এম এস সি।

এই সময়কার অর্থাৎ স্বামীজীর ছোটবেলাকার কিছু ঘটনা যা তাঁর ভাইঝি স্বাগতা সরকার স্বামীজীর কাছ থেকে শুনে লিখে রেখেছিলেন, তা এইরকম— স্বামীজীর বয়স তখন দু'বছর। দাদার পিছু পিছু পুকুরপাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আর দাদাকে দেখতে পেলেন না। পরিবর্তে যা দেখলেন তা শুনে আমাদেরও গা শিউরে উঠবে। একটা সাপ স্বামীজীর দিকে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে একটু পরেই সাপটা নিজে থেকেই সরে গেল। ছোটবেলাকার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী জানিয়েছেন, মা হাতে করে দু-গাল খাইয়ে দিলে তবেই ঘুমতে যেতেন।

যখন তিনি কলেজের ছাত্র, ১৯৭১-এর শেষের দিকে, সহপাঠি নির্মলচন্দ্র মাইতির সঙ্গে আরামবাগের বটতলার (থানার) কাছে পাঁচুবাবুর বাড়ির নীচতলার এক কুঠুরিতে স্থানীয় সঙ্ঘ (আর এস এস) কার্যালয়ে গেছিলেন। সেই কুঠুরিতে একটাই জানালা— বাড়ির ভেতরের দিকে। কোনো লম্বা মানুষ হাত তুললে কড়িকাঠে ঠেকে যায়। একটা জোগাড় করা ছোট স্ট্যান্ড ফ্যান আছে বটে, তবে সেটাকেই মাঝে মাঝে হাওয়া দিতে হয়। সেই কার্যালয়ে সঙ্ঘের একজন প্রচারক থাকেন, বছরখানেক হলো তিনি কাটোয়া থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছেন। নির্মলের সঙ্গী বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় হলো। বুশ শার্ট আর ফুলপ্যান্ট পরা এক যুবক। খুব শান্ত। খুব আস্তে আস্তে কথা বলে। শহরের পাশে বালিবেলা গ্রামে তার বাড়ি। সেই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বালিবেলা গ্রামে শাখা শুরু হয়েছে। তাদের পরিবারের সব ভাইয়েরাই ক্রমে সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিনি নিজে সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ ও অন্যান্য ভাইয়েরাও সঙ্ঘ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। পুরো পরিবারই সঙ্ঘময় হয়ে গিয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় (১৯৭৫-১৯৭৭) এই পরিবারই ছিল একটা আশ্রয়স্থল। নবকুমার নিজেও বর্ধমানে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কয়েক মাস কারাবন্দি ছিলেন। এরপর কয়েক মাস বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে শিক্ষকতাও করেন।

'The Caravan' পত্রিকা ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখের সংখ্যায় লীনা গীতা রঘুনাথ-এর 'Swami Aseemanand's radical service to the Sangha' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। প্রতিবেদনটি স্বামী অসীমানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা। ২০১১ সালের জানুয়ারির প্রথমদিকে আম্বালার সেন্ট্রাল জেলে নেওয়া এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লেখিকা নিজেই জানিয়েছেন যে, গত দু-বছরেরও বেশি সময়ে তিনি যে চারটি সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এটি তার প্রথম সাক্ষাৎকার "This was the beginning of the first of four interviews..".

কলকাতায় এসে স্বস্তিকার তৎকালীন সম্পাদক বিজয় আঢ্য-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এই প্রতিবেদক জানিয়েছেন, অসীমানন্দ ও তাঁর পরিবার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুগামী ছিলেন। তাঁর গান্ধীবাদী পিতৃদেব আর এস এসের বিষয়ে সতর্ক করে দিলেও "The balance of Aseemananda's beliefs tilted dramatically during his twenties, under the mentorship of two Sangha members"। তাঁদের একজন সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের তৎকালীন প্রান্ত প্রচারক স্বর্গীয় বসন্তরাও ভট্ট। প্রতিবেদকের ভাষায়, ... "fiercely dedicated to the mission of the RSS, but had a soft, disarming charisma"।

স্বামী অসীমানন্দের পরিবার এতটাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরাগী ছিল যে শ্রীআঢ্য নিজেই স্বীকার করেছেন, "It was infact from his house that I read all the major literature on Vivekananda'। এই বাড়ির বইয়ের আলমারিতে একনাথ রানাডে সম্পাদিত 'A Rousing call to the Hindu Nation' বইটিও ছিল। অসীমানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের মতে প্রত্যেক ধর্ম সমান। তাঁরা খ্রিস্টমাস, ইদ পালন করে, আমিও তা করি। তখন শ্রী আঢ্য তাঁকে বলেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ এরকম বলেছিলেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। রানাডের বইটা নিয়ে তিনি স্বামীজীর লেখা সেই উদ্ধৃতিটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে বলা হয়েছিল— "Every man going out of the Hindu pale is not only a man less, but an enemy the more"। প্রতিবেদক জানিয়েছেন, অসীমানন্দ তাকে

মা ও ভাইদের সঙ্গে স্বামী অসীমানন্দ।

বলেছিলেন, 'I got a huge shock after reading this'। তারপর বেশ কিছুদিন তিনি চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তার সীমিত ক্ষমতায় বিবেকানন্দের শিক্ষাকে অনুভব বা সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তখন থেকেই মনস্থ করেছিলেন 'I will follow it all my life'।

এক বছরের কিছু পরে হঠাৎ একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় বাগমুণ্ডির ছাত্রাবাসে তিনি ফিরে এলেন। পরনে গৈরিক বসন। না, নবকুমার সরকার নন, এখন তিনি স্বামী অসীমানন্দ। ছাত্রাবাসে আনন্দ আর ধরে না। অনেকদিন পর তাদের প্রিয়জনকে কাছে পেয়েছেন। বলরামদাও খুব খুশি। অনেক জমে থাকা কথা দু'বন্ধুর মধ্যে হলো। কলকাতা থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথমে উত্তরকাশী গিয়েছিলেন। উত্তরকাশীর বিস্তৃত এলাকার পর্বতে অসংখ্য গুহা, কন্দর। সেখানে সব সাধু-সন্তাদের বাস। ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন। চারিদিক শান্ত সমাহিত। এখানে বিচরণ করলে শরীর মনে এক প্রসন্নতা নেমে আসে। এই উত্তরকাশীতেই একদিন এক বঙ্গভাষী সাধকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বয়সে যুবক ওই সাধুর নাম পরমানন্দ গিরি। এই সাধকের জীবনেও অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ। কিন্তু সেসব অন্য প্রসঙ্গ।

স্বামী পরমানন্দ তাঁর গুরুদেবের গুহায় স্বামী অসীমানন্দকে নিয়ে যান। অতি দুর্গম সেই স্থান। বছরে একবার মাত্র গুরুদেব সেই গুহার বাইরে আসেন। বয়স প্রায় তিনেশা বছর বলে অনুমান। নগ্নদেহী এই গুরুদেব আহার করেন না বললেই চলে। বায়ু সেবনেই জীবিত থাকেন। শরীরের দিকে কোনো খেয়াল নেই। তাঁর জটা মাটি স্পর্শ করেছে। স্বামী অসীমানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ হয়ে উঠলেন পরস্পরের গুরুভ্রাতা। পরবর্তীকালে স্বামী পরমানন্দ বর্ধমান জেলার রায়নার কাছে বনগ্রামে পরমানন্দ মিশন নামে এক আশ্রম স্থাপন করেন। অসীমানন্দ তাঁর কাছেই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাস জীবনের পরম্পরা অনুসারে স্বামী অসীমানন্দজী স্থির করলেন, পরিব্রাজক হিসেবে তিনি সারা দেশ পরিভ্রমণ করবেন। দেশের মানুষকে খুব কাছ থেকে জানাই এই পরিব্রাজক জীবনের উদ্দেশ্য। আক্ষরিক অর্থেই কপর্দক শূন্য হয়ে তিনি পথে পা বাড়ালেন। কারও কাছেই নিজের প্রয়োজনের জন্য কোনো কিছুই চাইবেন না, এমনকী ক্ষুধার অন্ন বা পরিধেয় বস্ত্রও। সমাজের মানুষই তাঁর এই ব্রতের কথা বুঝে নিজেরাই পাথেয় সংগ্রহ করে তাঁকে দেবেন— এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস থাকলে কী হবে, পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর জন্য যে কিছু করা দরকার, সমাজের বেশিরভাগ মানুষেরই তেমন ধারণা ছিল না। কোনো কোনো দিন তাই অভুক্তই থাকতে হয়েছে। পরিধেয় বস্ত্রেও ফাটল ধরেছে। সব মিলিয়ে সত্যিই এক করুণ অবস্থা। অনেকটা ভিখারির মতো। কিন্তু এই অবস্থাতেও বিশেষত ওড়িশা আর ঝাড়খণ্ডের বনবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পরিভ্রমণ করে দেশ ও সমাজের প্রকৃত

অবস্থাটা অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। এই পরিব্রাজন কালে কয়েকজন সাধু-মহাত্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর পরিব্রাজক জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে সাধু-সন্তরা তাঁকে এই ব্রত ত্যাগ করে তাঁদের সহযাত্রী হতে বলেছিলেন। কেননা, বর্তমান সমাজ পরিব্রাজক ব্রতের মাহাত্ম্য বোঝে না। তাই এখন এই ব্রত মেনে চলা খুব কঠিন। তবুও স্বামীজী আপন ব্রতেই অটল রইলেন। সাধু-সন্তদের পরামর্শের সারবত্তা বুঝেও তিনি পরিব্রাজক ব্রত থেকে বিরত হলেন না এবং শেষপর্যন্ত তা সম্পন্নও করলেন।

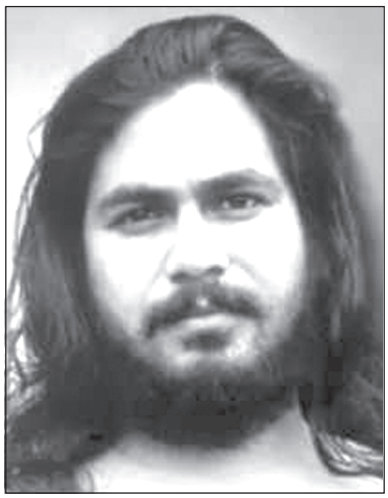

পরমানন্দ গিরি

বসন্তরাও ভট্ট

এই পরিব্রাজনের সময় অমরকণ্টকে বাবা কল্যাণদাসজী মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরিব্রাজক ব্রত শেষ হতেই স্বামী অসীমানন্দ অমরকণ্টকে কল্যাণদাসজীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বনবাসী ছাত্রদের ছাত্রাবাস পরিচালনার অভিজ্ঞতার কথাও জানালেন। কল্যাণদাসজী তখন নিজেদের আশ্রমের সেই ছাত্রাবাস পরিচালনার দায়িত্ব অসীমানন্দজীকে দিলেন। এই আশ্রমে আরও অনেক সাধুসন্ত থাকতেন। আহারের সময় আশ্রমের সাধুসন্তরা আলাদা পঙ্‌ক্তিতে বসতেন। স্বামীজী কিন্তু বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। স্বভাবতই এ নিয়ে কথা উঠল। কল্যাণদাসজীও স্বীকার করলেন, ভোজনের সময় সাধুসন্তরা যে আলাদা বসেন তাতে কোনো অন্যায় নেই। তাঁরা আলাদা বসতেই পারেন। এই বিধান দিলেও কল্যাণদাসজী নিজে কিন্তু বনবাসী বালকদের পঙ্‌ক্তিতে গিয়ে বসলেন। তাঁর এই আচরণেই স্পষ্ট হয়ে গেল সাধুসন্তদের জন্য আলাদা কোনো পঙ্‌ক্তির প্রয়োজন নেই।

স্বামীজী অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গেই আশ্রমের কাজ দেখভাল করছিলেন। ছাত্রদের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় একদিন উজ্জয়িনীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দজী কল্যাণদাসজীর আশ্রমে এলেন। স্বাভাবিকভাবেই ভাস্করানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ঘটল। পরিচয়সূত্রে স্বামীজী একথাও জানালেন যে, এই অমরকণ্টকেই রায়পুরের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী আত্মানন্দজীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছে। ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার অবুঝমাড়, নারায়ণপুর এলাকার বনবাসীদের সেবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে তখন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল। আত্মানন্দজী অবুঝমাড়ে সেবা কাজের জন্য স্বামীজীকে যেতে অনুরোধ করলেন। আত্মানন্দজীর পরামর্শ মতোই স্বামীজী ও ভাস্করানন্দজী অবুঝমাড়ের উদ্দেশে রওনা দিলেন। সত্যি বলতে কী, নারায়ণপুরে মিশনের কাজ তখন সবে শুরু হয়েছে। থাকার ব্যবস্থাও ঠিকমতো হয়ে ওঠেনি। গ্রামের বনবাসীদের ঝুপড়ির মধ্যেই থাকতে হতো। অবুঝমাড়ের বনবাসীদের ভাত রান্না করে খাওয়ার অভ্যাস তখনও হয়নি। জঙ্গলে যে ফলমূল বা অন্য যা কিছু পাওয়া যায়, তা খেয়েই তারা জীবন ধারণ করত। যেখানে স্বামীজীরা থাকতেন, তাদেরই একটি মেয়ে তাদের ভাত রান্না করে দিত। বাস্তবে মেয়েটি ভাত রান্না করতেও জানত না। কেননা, ওই দরিদ্র বনবাসীদের সংসারে ভাত খাওয়াটাও ছিল একরকম বিলাসিতা। একটা পাত্রে জল ঢেলে সে উনুনে বসাত আর জলটা যখন ফুটত তখন তাতে চালগুলো ঢেলে দিত। ভাত এভাবেই রান্না করতে হয় বলে তার মনে হয়েছিল। তারপর তা স্বামীজীদের দিয়ে বলতো, এটা আপনাদের, আমি খাব না। অনেকভাবে বোঝানোর পর শেষপর্যন্ত মেয়েটি খেতে রাজি হলো। কীভাবে ভাত রান্না করতে হয় স্বামীজীরা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

একদিন বীজাপুর যাওয়ার সময় মেয়েটি স্বামীজীর কাছে পয়সা চাইল। স্বামীজী ভাবলেন, রান্না ইত্যাদি কাজ করে দেওয়ার জন্য বোধ হয় সে পয়সা চাইছে। স্বামীজী মেয়েটিকে দশটা টাকা দিলেন। একী! স্বামীজী দেখলেন, মেয়েটি বাজার থেকে একটা মাটির ঘড়া কিনে নিয়ে এসেছে। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, ঘড়া নিয়ে কী করবে? মেয়েটি বলল, এই ঘড়ায় করে আপনাদের জন্য জল আনব। আর পাঁচটা টাকা ফেরত দিয়ে বলল, এটা বেঁচেছে। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজের জন্য কী এনেছ? মেয়েটি বলল, বাজার গিয়ে আমার জন্য আবার কী আনব? আপনাদের ঘড়া কেনার জন্যই তো বাজারে গিয়েছিলাম।

অবুঝমাড়ে বনবাসীদের মধ্যে একশ্রেণীর মানুষ ছিলেন, যাদের

গায়ের রং ফর্সা। এদেরই সঙ্গে স্বামীজীর একবার দেখা হলো। তাদেরই একজন এগিয়ে এসে স্বামীজীর সঙ্গে করমর্দন করে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করল— হাউ ডু ইউ ডু? স্বামীজী খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। স্বামীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে ইংরাজি ভাষা শিখলে? লোকটি বলল, এক ইংরেজ সাহেব এখানে এসেছিলেন। সে আমাকে অসমে নিয়ে গিয়েছিল। অসমে তার চা-বাগান ছিল। আমি সেখানে অনেকদিন কাজ করেছি। সাহেব যখন নিজের দেশ বিলেত যাচ্ছিল তখন আমাকেও নিয়ে গেল। স্বামীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সেই দেশে এই পোশাকে গিয়েছিলে? সে বলল, না সাহেব, এভাবে যাইনি, জামাপ্যান্ট পরে গেছিলাম। স্বামীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই দেশে থাকলে না কেন? সে বলল, নিজের দেশই ভালো সাহেব। স্বামীজী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জামাপ্যান্ট পরছ না কেন? সে বলল, নিজেদের লোকেদের সামনে ওই পোশাক পরতে ভালো লাগে না। নিজেদের পোশাকই (ল্যাঙ্গট) পরতে ভালো লাগে।

এইসময় বস্তারে নকশালদের কাজ শুরু হয়েছে। বনবাসীরা অত্যন্ত সরল হলেও পুলিশের ঝুট ঝামেলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে তারা এক উপায় বার করেছিল। তাদের অবস্থা ছিল অনেকটা শাঁখের করাতের মতো। একদিকে নকশাল, অন্যদিকে পুলিশ। যেদিকেই যাক না কেন, দুদিকেই বিপদ। পুলিশ এসে নকশালদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলে নকশালরা বাঁ দিকে গেলে তারা ডানদিকে গেছে বলত। নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আজও তারা এরকমই সব উপায় অবলম্বন করে আছে।

একবার পুলিশ আসার খবর পেয়ে গ্রামের সব লোক পালিয়ে গেল। স্বামীজী কিন্তু গ্রামেই থেকে গেলেন। স্বামীজী পুলিশের কাছে নিজের পরিচয় জানালেন। পুলিশ চলে যাওয়ার পর আবার সব লোক গ্রামে ফিরে এলো। স্বামীজী তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা পুলিশ দেখে পালিয়ে গেলে কেন? বনবাসীরা জানায়, পুলিশ গ্রামে এসে তাদের খুব মারধর করে।

একবার এই অঞ্চলের এক গ্রামে এক ব্যক্তির সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হলো। বনবাসীদের মতোই খালি গায়ে ও ল্যাঙ্গট পরে আছে। সে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করল— আপনি কে?

আমি এখানকারই একজন।

কিন্তু আপনি তো এখানকার নন?

স্বামীজী বললেন, আমি দিল্লি থেকে এসেছি। বনবাসীদের জীবন ভালোভাবে জানার জন্য এখানে আমার আসা। এটাই আমার গবেষণার বিষয়।

স্বামীজী বস্তারের অবুঝমাড়ে প্রায় দু'বছর ছিলেন। সেখানে একবার ম্যালেরিয়া রোগে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই রোগ সারাতে গিয়ে তাকে যে ওষুধ খেতে হলো, তার সাইড এফেক্ট-এ তিনি মোটা হয়ে গেলেন। নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে দু'বছর থাকার পর তিনি আবার সুস্থ জীবন ফিরে পেলেন। নারায়ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমকে ঘিরে তখন নানা কর্মদ্যোগ শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ছাত্রাবাস, অতিথি নিবাস, অধিকারী ও পদাধিকারীদের নিবাস তৈরি হয়েছে। তখন বস্তারের কালেক্টর ছিলেন বি ডি শর্মা। তাঁর সঙ্গে কর্মরত প্রশাসনিক অধিকারী ও কর্মচারীদের আবাসে যেসব বনবাসী মেয়েরা কাজ করত, এদের সংস্পর্শে এসে তাদের অনেকেই সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। কালেক্টর শর্মাজী এইসব সন্তানসম্ভবাদের আইন মোতাবেক বিবাহের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ঘটনা হলো, এইসব সরকারি কর্মচারীদের যখন স্থানান্তর হতো তখন তারা স্ত্রী ও সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। এর ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তানদের ভর্তি করাতে গিয়ে এইসব বনবাসী মায়েদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হতো। সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পিতার নাম লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। একজন ভর্তি হতে এসে কিছুতেই পিতার নাম বলতে পারল না। ফলে সমস্যা তৈরি হলো। তখন স্বামীজী নিজেই এগিয়ে এসে শিশুটির পিতার নামের স্থানে নিজের নাম লিখে দিলেন। বিদ্যালয়ে শিশুটির ভর্তির পথ সুগম হলো।

প্রায় বছর পাঁচেক বস্তার এলাকায় থাকার পর আবার তাঁর মনে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ করার ইচ্ছা জাগলো। কলকাতায় এসে স্বামীজী মাননীয় বসন্তরাও ভট্টর সঙ্গে দেখা করলেন। মাননীয় বসন্তদা দীর্ঘ ১৭ বছর বাংলায় সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। জরুরি অবস্থা উঠে গেলে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের বাংলা-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। সেই সূত্রেই মাননীয় বসন্তদার সঙ্গে দেখা করে তিনি নিজের ইচ্ছার কথা জানালেন। এইসময় আন্দামান-নিকোবরে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজের বিস্তারের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছিল। আন্দামান-নিকোবরে তখন ছত্তিশগড়, রায়গড়, সরগুজা, রাঁচি, গুমলা, লোহারদাগা থেকে বহু জনজাতি মানুষ শ্রমিক হিসেবে গিয়েছিল। আন্দামান-নিকোবরে এদের রাঁচিওয়ালা বলা হতো এবং এদের বস্তিগুলোকে রাঁচি বস্তি নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলবাদ, সিরকাকুলাম থেকেও বহু শ্রমিক সেখানে কাজ করতে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে মাননীয় বসন্তদা আন্দামানে গিয়ে সেখানকার বনবাসী সমাজের স্থিতি সরেজমিনে দেখে এসেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, আন্দামানে বনবাসীদের মধ্যে সেবাকাজের জন্য কাউকে পাঠাতে হবে। তিনি এই কাজের জন্য স্বামীজীকে আন্দামানে যেতে বললেন। এই কাজের প্রস্তুতির জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কেন্দ্র যশপুরে স্বামীজীকে পাঠালেন। যশপুরে স্বামীজী এক বছর ছিলেন। আশ্রমে ছাত্রদের বালকদের পড়ানোর দায়িত্ব

তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রামায়ণও গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেন। নিজের কথা ও ব্যবহারের কারণে স্বল্প দিনের মধ্যেই তিনি বালকদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। ছাত্রদের পড়াশোনার মানও এতে অনেকটা উন্নত হলো।

যশপুর আশ্রমে একবছর থাকার পর পরিকল্পনামতো তিনি আন্দামানে পৌঁছালেন। আন্দামানে রাঁচি বন্ধুরা অচ্ছ্যুত ছিলেন। সমাজের এক ধারে তাদের ঠাঁই ছিল। কারও সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না। তাই তাদের মধ্যে কাজ করার দরকার ছিল। স্থানীয় লোকেদের ধারণা, রাঁচির জনজাতিরা খ্রিস্টান। তারা হিন্দু নয়। কেননা, তারা হিন্দুদের কোনো উৎসব পালন করে না। তাদের বসতিতে কোনো মন্দিরও ছিল না। তারা রবিবার দিনে চার্চে যায়, খ্রিস্টানদের মতো ২৫ ডিসেম্বর দিনটিকে বড়দিন হিসেবে পালন করে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের নামও খ্রিস্টানদের মতো রাখে। এইরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে স্বামীজী রাঁচি এলাকা থেকে আসা জনজাতিদের মধ্যে কাজ শুরু করলেন। দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভজন-কীর্তন শুরু হলো। কাজ শুরুর সময় অনেকরকম অসুবিধার মুখোমুখি হতে হলো। একদিন বিকেলে রাঁচি বসতির একজনের ঘরে তিনি পৌঁছালেন। জঙ্গলের ধারেই সেই ঘর। সেই ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর আগে থেকে পরিচয় ছিল না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জঙ্গলের পথ দিয়ে চলার সময় কখন যে জামাকাপড়ে জোঁক ঢুকে গেছে তা টের পাননি। পরে জামাকাপড়ে রক্ত দেখে টের পেয়েছিলেন তার শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছে। সেই ঘরে তখন এক মহিলা ছিলেন। তিনি জানালেন, ঘরের পুরুষ মানুষটি এখন নেই। একটু পরে ফিরবে। মহিলার কথাটা বুঝতে স্বামীজীর অসুবিধা হলো না। স্বামীজী ঠিক কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছেন। আবার সন্ধ্যাও নামছে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, এমন সময় ঘরের পুরুষ মানুষটি ফিরে আসায় সেই ঘরে আশ্রয় মিলল। যেখানে কোনো পরিচিতি নেই সেখানে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এরকম ঝুকি নেওয়া ছাড়া অন্য আর কী বা উপায় আছে?

আর একদিনে ঘটনা। স্বামীজী রাঁচি বসতির কোনো এক গ্রামে যাচ্ছিলেন। এবারে অবশ্য যেখানে যাচ্ছেন তার নাম ঠিকনা ছিল। যিনি তাঁকে যেতে বলেছিলেন তিনিও সেখানে পরে যাবেন বলে জানিয়েছেন। কথামতো স্বামীজী বিকেলের দিকে সেই ঘরে পৌঁছালেন। কিন্তু সেই ঘরের যিনি কর্ত্রী ছিলেন তিনি একটু ভয় পেয়ে গেলেন। এই দূর গ্রামে সাধু-সন্তরা কখনো আসে না। যারা আসে তারা সাধুর বেশে বাজে লোক। ঠকিয়ে চুরি করে নিয়ে পালায়। স্বামীজী নিজের ও যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন তার কথা বললেও মহিলার মন থেকে ভয় গেল না। অগত্যা স্বামীজীকে অন্য আর এক গ্রামে এক পরিচিতর বাড়ি যেতে হলো। একটু পরে স্বামীজীকে যিনি পাঠিয়েছিলেন, তিনি উপস্থিত হলে সেই মহিলা বললেন, তিনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কেননা, সবাই এরকমই বলে। মহিলা যেন একাজ করেছেন বলে একটু আত্মপ্রসাদই লাভ করলেন।

তিনি লক্ষ্য করলেন, খ্রিস্টান মিশনারিরা আন্দামান-নিকোবরের বনবাসীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরণ করছে। তিনি স্থির করলেন, এদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য শতকষ্ট হলেও এই বনবাসীদের মধ্যেই থাকতে হবে। সংকল্প মতো কাজও শুরু করলেন। ধীরে ধীরে তাদের মন জয় করলেন। দীর্ঘ তিন বছরের চেষ্টায় তাদের একাংশ পরম্পরাগত ধর্মে ফিরে এলো। বনবাসী পরিবারগুলি থেকে বালকদের নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করলেন। এর আগে হিন্দু সন্ন্যাসীরা আন্দামানে গেছেন, কিন্তু দর্শক হিসাবে। অথচ খ্রিস্টান মিশনারিরা সবসময় বনবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে। স্বামী অসীমানন্দ সাড়ে চার বছর আন্দামানে ছিলেন। এরকম অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে মায়াবন্দরে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এজন্য তাঁকে স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

স্বামীজীর এই সম্পর্কের ফলে রাঁচি বসতিতে রামনবমী, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী, রক্ষাবন্ধন, হোলি, দীপাবলী, বসন্ত পঞ্চমী প্রভৃতি উৎসব ক্রমশ শুরু হলো। রাঁচি জনজাতিদের পরম্পরাগত উৎসব করমা, জিতিয়া হতে লাগল। আন্দামান-নিকোবরের রাঁচি বসতিতে যে জনজাতিরা রয়েছে, তারা যে হিন্দুই তা ক্রমশ স্থানীয় মানুষরা বুঝতে পারল। রাঁচি বসতির এইসব উৎসবে অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল থেকে আসা জনজাতিরাও ক্রমশ শামিল হতে শুরু করল। পোর্টব্লেয়ার, রঙ্গত, বকুলতলা, মায়াবন্দর, ডিগলিপুর, লিটল আন্দামানের মতো প্রমুখ স্থানগুলিতে হনুমানজয়ন্তী বিপুল উৎসাহে জাঁকজমকের সঙ্গে হতে লাগল। ভজন, কীর্তন, শোভাযাত্রা হতে লাগল। পোর্ট ব্লেয়ারে প্রথমবার রামনবমী উপলক্ষে বিশাল মিছিল বের হলো। প্রায় দশ হাজার মানুষ সেই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানকার হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার জন্য স্বামীজী পোর্ট ব্লেয়ারে সম্মিলন কক্ষ-সহ একটি মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের আন্দামান শাখার একটি বিধিবদ্ধ সমিতিও গঠিত হলো।

আন্দামান নিকোবরে স্বামীজীর কাজের পরিণাম দেখে তাঁর উপর বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় শ্রদ্ধা জাগরণ প্রমুখের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি তখন থেকে সমগ্র দেশে বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জাগরণ কাজের বিস্তার করতে লাগলেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ডিমাসা, কার্বিয়াংলঙ, ডীফু, উমরাংসু, হাফলং, নায়বাংগ প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে বনবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। সেইসঙ্গে ত্রিপুরার বনবাসী

অঞ্চলগুলিতেও পরিভ্রমণ করলেন। ডিমাসা জনজাতির আরাধ্য দেবতা শিবরায় (ভগবান শিব)-এর ভজন সংগ্রহ করে কয়েকটি গ্রামে দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভজন-কীর্তন শুরু করলেন। অসমে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজের সময় এক মহিলা তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চাইলেন। স্বামীজী ওই মহিলাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এভাবে কাজ করা তাদের পদ্ধতি নয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওই মহিলার উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে গেল। আর কোনো উপায় না দেখে ওই দুষ্ট মহিলা স্বামীজীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় হলো।

স্বামীজী এরপর দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে পরিভ্রমণ শুরু করলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলবাদ, সিরকাকুলম, মহবুবনগর-সহ বিশাখাপট্টনম জেলায় মাসাধিককাল ধরে বনবাসী সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। ভজন-কীর্তন ও রামায়ণ গানের মাধ্যমে জাগরণের কাজ চলতে লাগল। খুন্টি ও সিমডেগা জেলাতেও গেছিলেন। যশপুর ও গুমলা জেলার পাশে বারাবনী, মোফরাগ্রামে লাবা ও শঙ্খ নদীর সংগমস্থলে শঙ্খেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করে মহাশিবরাত্রিতে মেলার আয়োজন করলেন। যশপুর ও সিমডেগা — এই দুই জেলারই কাছাকাছি জায়গায় সারদা ধাম প্রতিষ্ঠা করে সারদা উৎসব শুরু করলেন। এইসব এলাকার বেশিরভাগ মানুষই মজদুর ও অবহেলিত শ্রেণীর। তবুও তাদের মধ্যে দেবদেবীর প্রতি, মা গঙ্গার প্রতি ভক্তির কোনো অভাব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দিনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে শ্রদ্ধা জাগরণ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার চা-বাগানগুলিতে সম্পর্ক স্থাপন করে শ্রদ্ধা জাগরণ কেন্দ্রের কাজ শুরু করেছিলেন। ছত্তিশগড়ে বস্তার জেলার সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল। এই সময় বস্তার জেলা পরিভ্রমণের সময় তিনি 'ফিসচুলা' রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অতিথি নিবাসে কিছুদিন থাকেন। স্বামীজী চলে যাওয়ার পর একদিন একটি মেয়ে স্বামীজীর খোঁজ করতে সেই হাসপাতালে এলেন। সেখানকার কর্মচারীরা জানায় যে, স্বামীজী কয়েকদিন আগেই হাসপাতাল থেকে চলে গিয়েছেন। একথা শুনে ওই মেয়েটি কেঁদে ফেলল। বলল, স্বামীজী আমার পিতাজী। আমি তো এতদিন পিতাজী হিসেবে স্বামীজীর নামই বলে এসেছি। কর্মচারীরা তখন মেয়েটিকে নিয়ে অতিথি নিবাসে যায়। স্বামীজীর সঙ্গে মেয়েটির সাক্ষাৎ হলো। মেয়েটি বলল, ইতিমধ্যে সে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর মা এক মুসলমানকে বিবাহ করেছে। সে নিজেও এখন মায়ের কাছে রয়েছে। তার বিবাহ বেনারসে হচ্ছে। স্বামীজী এসেছেন শুনে সে দেখা করতে এসেছে।

মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা, বেতুল, খরগোন, খাণ্ডওয়া, ধার, ঝাবুয়া, আলিরাজপুর ইত্যাদি বনবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে স্বামীজী শ্রদ্ধা জাগরণ কাজের বিস্তার ঘটাতে লাগলেন। বনবাসীরা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আদরযত্ন করতেন। শ্রদ্ধা জাগরণের কাজে এরপর তিনি মহারাষ্ট্রের নন্দওয়ার, নাসিক, ধুলে, জলগাঁও, ভুসওয়াল অঞ্চলের বনবাসী গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করেন। পাশাপাশি গুজরাতের ডাংস, ধরমপুর, বলসাড় জেলা, কর্ণাটকের কুর্গ, সোলুগা, মহীশূর জেলাতেও যান। সিদ্ধি, গৌলী জনজাতিদের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করেন। তামিলনাড়ুর উঠি, সেলম, কেরলের ওয়ানাডে, কুরচা, কুকেসা জনজাতিদের গ্রামে বনবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

এভাবে সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় বনবাসী অঞ্চলে প্রবাস করে স্বামীজী শ্রদ্ধা জাগরণের কাজে গতি সঞ্চার করেন। এই সময় স্বামীজীর মনে এক ভাবনার উদয় হলো। এরকম নিরন্তর পরিভ্রমণ না করে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজ করাই ভালো বলে তাঁর মনে হলো। স্বামীজী তাঁর ইচ্ছার কথা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের তৎকালীন অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক ভাস্কররাওজীকে জানালেন। স্বামীজী নিজের পরিকল্পনা মতো গুজরাতের ডাংস জেলায় গেলেন। গুজরাত বনবাসী কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে ওয়াঘাইতে বালকদের ছাত্রাবাস ছিল। স্বামীজী সেখানেই নিজের কেন্দ্র স্থির করলেন। সেটা ১৯৯৬ সাল। গুজরাতের দক্ষিণে ডাংস একটা ছোট জেলা। লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে ২ লাখ। বেশিরভাগই মানে ৯৩ শতাংশই জনজাতি। ব্রিটিশ আমল থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ। খ্রিস্টান মিশনারিদের রমরমা। তারা ডাঙ্গসকে 'পশ্চিমের নাগাল্যাণ্ড' বলত। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো এখানেও কাজ করা ছিল খুব বিপজ্জনক।

ডাংস জেলার ভীল, কোঙ্কণা জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামে গ্রামে গিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে লাগলেন। ওইসময় কোনো সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতেই সবাই ওঠাবসা করতেন। স্বামীজী কিন্তু ভীল বনবাসীদের ঘরে থাকতেই পছন্দ করতেন। বলতেন, তোমরা যা খাও তাই খাবো। নাগলী রুটি আর বরী-র ভাত তাদের সঙ্গে বসেই খেতেন। আর রাতে ঘরের পাশে খোলা জায়গায় খাটিয়া পেতে শুতেন।

তিনি দেখলেন, ওই জেলাতে খ্রিস্টান মিশনারিরা ব্যাপকভাবে তাদের কাজের জাল বিস্তার করেছে। সেখানকার বনবাসী সমাজকে ভুল বুঝিয়ে পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। কোনো বনবাসী পরিবারের চাই ভাইয়ের দুই ভাইকে ভুল বুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিভেদ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। তাদের পিতার স্বর্গবাস হলে হিন্দু দুই ভাই দাহ করতে চাইলে অন্য দুই ভাই কবর দিতে চায়। এই পারিবারিক ঝগড়া ক্রমে ব্যাপক আকার নিয়েছে। স্বামীজী তাই

বনবাসীদের মধ্যে থেকেই তাদের মন জয় করতে শুরু করলেন। ডাঙ্গস জেলাকে খ্রিস্টান জেলাতে পরিবর্তিত করার যে ষড়যন্ত্র খ্রিস্টান মিশনারিরা করেছিল, তা ব্যর্থ হলো। এজন্য অবশ্য স্বামীজীকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেসময় খুব ভোরে উঠে স্বামীজী স্নানাদি সেরে নিতেন। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বনবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। বনবাসী গ্রামে দুপুরবেলা সবাই কাজকর্মের জন্য বাইরে চলে যেত। তাই দুপুরের আহারের কোনো ঠিক ছিল না। যদি পাওয়া যেত তো খেতেন, নচেৎ রাতে যেখানে থাকতেন সেখানেই খেতেন। খাওয়া-দাওয়ার এই অনিয়মের জন্য পেটের অসুখ শুরু হলো। তবে তাতে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজে কোনো ছেদ পড়ল না। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজ চলতেই লাগল। এইসময় ঘরে ঘরে হনুমানজীর ফটো টাঙ্গানো, গলায় হনুমানজীর ছবি যুক্ত লকেট পরানোর কাজ শুরু হলো। যে গ্রামে রাত্রিবাস করতেন সেখানে ভজন-কীর্তন, হনুমান চালিশা পাঠ, আরতি ও কথকতা হতো।

এক কথায়, আন্দামানের মতো এখানেও তিনি একই পদ্ধতিতে কাজ করেছিলেন। আশ্রমের ছাত্রাবাসে ফুলচাঁদ বাবলো নামে এক ছাত্রকে তাঁর সহায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কোন গ্রামে গেলে তাদের কাজ সহজে করা যায় এবং তাদের কাজের কিছু সহযোগীও পাওয়া যাবে— এই বিষয়ে ফুলচাঁদের পরামর্শ খুব কাজে লাগত। তিনি ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে সপ্তাহখানেক থাকতেন এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে যেতেন। হিন্দু ধর্মের কথা বলতেন, হুমানজীর লকেট দিতেন, হনুমান চালিশার কপি দিতেন। ভজন গাইতেন। আর খ্রিস্টান ধর্ম যেন কখনো গ্রহণ না করে এ বিষয়ে সাবধান করে দিতেন। যারা খ্রিস্টান থেকে হিন্দু হতে চায় তাদের তালিকা তৈরি করতেন। যখন তিনি ও তার সঙ্গীরা অন্য গ্রামের দিকে আবার পা বাড়াতেন, তখন তারা এক রকম নিশ্চিত থাকতেন এই গ্রামের কুটিরগুলিতে গেরুয়া পতাকা উড়তে থকবে।

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বালাসাহেব দেশপাণ্ডের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর গুজরাতের ডাঙ্গস মহকুমার ডোলদাতে এক বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। কোলাপুর থেকে করবীর শংকরাচার্য এই সম্মেলনে এসেছিলেন। প্রায় তিন চারশো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দুষ্কৃতী এই সম্মেলন বানচাল করে দেওয়ার জন্য হামলা চালায়। ফলে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৪৪ ধারা জারি হয়। স্বামীজী মঞ্চ থেকে বারবার সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানান। সভা শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হলেও সংবাদ মাধ্যম ঘটনার বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে। প্রচার করা হয়, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ও চার্চের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী ডাংসে আসেন। কিন্তু তিনি শুধু সেখানকার চার্চে যান এবং তাদের কথা শুনেই সংবাদ মাধ্যমকে জানান যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রবল অত্যাচার হয়েছে।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া ও লালুপ্রসাদ যাদবও ডাঙ্গসে যান। তাঁরা শুধু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ীও বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ডাঙ্গসে আসেন। ওইসময় সুপরিচিত সর্বোদয়ী নেতা ধেনুভাই স্বামী অসীমানন্দের প্রশংসা করে বলেন, বনবাসী মানুষদের সেবা করার জন্য তাঁর মতো মানুষ এর আগে এখানে কখনো আসেননি। কেউ অসুস্থ হয়েছে জানতে পারলে তিনি গাড়ির ব্যবস্থা করে তাকে হাসপাতালে পাঠাতেন। পুরো এলাকার মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ডাংস পরিব্রমণ করে এসে মাননীয় অটলজী খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজকর্মের বিষয়টি জাতীয় স্তরে তুলে ধরলেন। আসল সত্যটা জানতে পেরে সারা দেশ হতবাক হয়ে গেল। সেবার আড়ালে খ্রিস্টান মিশনারিরা যে আদতে হিন্দুদের ধর্মান্তর করে চলেছে, তা প্রকাশ্যে এসে গেল। যাদের গ্রেপ্তার করে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তা প্রমাণের অভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো। এরপর ১৯৯৯ সালে হলগুড়িতে যে হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল, স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য তার সুরক্ষার ব্যবস্থা পুরোপুরি করেছিল। এইভাবে একের পর এক হিন্দু সম্মেলনের সাফল্য অসীমানন্দের সাংগঠনিক নৈপুণ্যকেই তুলে ধরে। সুপ্ত হিন্দুত্বের জাগরণের জন্য তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। ১৯৯৯-র জানুয়ারি সংখ্যায় The Week পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে অসীমানন্দ জানিয়েছেন, 'দারিদ্র্য দূরীকরণ বা উন্নয়নের বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চান না, বরং "We are only trying to uplift the tribals spiritually"।

অসীমানন্দ ডাংস-কে ভারতের অন্যতম একটা সুন্দর জায়গা বলে মনে করতেন। "You should see it during the monsoon'. Aseemananda told me in Ambala Jail"। একসময় যে ডাঙ্গস ছিল ধূসর, ফাঁকা বনাঞ্চল, আজ "miles and miles of world class highways carved into the mountains. These were built by the government of Aseemanand's most political patrons, Narendra Modi".।

গুজরাটের ডাংসের পর মহারাষ্ট্রের নন্দওয়ার, নাসিক, ধুলে জেলার বনবাসী অধ্যুষিত জায়গাগুলিতে স্বামীজী নিজের কাজকর্মকে কেন্দ্রীভূত করলেন। এইসময় স্বাধীনতা সংগ্রামী অবারে গুরুজীর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার হয়। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী

নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠানে।

জানান, চার্চের স্কুলগুলিতে ১৫ আগস্ট ও ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করা হয় না। অবারে গুরুজী কিন্তু স্বামীজীর কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। স্বামীজী তখন কিছু না বললেও পরে একদিন অবারে গুরুজীকে সঙ্গে নিয়ে চার্চ পরিচালিত একটি স্কুলে গেলেন। স্কুলের অধিকারীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের কথাবার্তার পর অবারে গুরুজী জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্কুলে ১৫ আগস্ট বা ২৬ জানুয়ারি পালন করা হয় কিনা? ওই স্কুলের অধিকারী বললেন, না, আমরা তা পালন কেন করব? এ তো খ্রিস্টানদের উৎসব নয়। স্কুলের অধিকারীর কথা শুনে অবারে গুরুজীর চোখ খুলে গেল। তিনিও স্বামীজীর কাজের সহযোগী হলেন। স্থানে স্থানে বনবাসী সম্মেলনের আয়োজন হতে লাগল। খ্রিস্টান মিশনারিরা এতদিন বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে নিজেদের জায়গির ভেবে এসেছে। এখন হিন্দু সংগঠনগুলি সেই এলাকায় কাজ শুরু করেছে। তাই খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরোধিতা শুরু হলো। এক এক সময় এই বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করে। যেমন ডাংসে। কিন্তু এতে পরিণাম ভালো হয়েছে। ছিন্দওয়াড়া, উপমওয়াড়া, নওয়াপুর ইত্যাদি নানা এলাকায় হিন্দু সমাজ জাগরিত হয়েছে। বিশাল সংখ্যায় হিন্দুর উপস্থিতিতে জাঁকজমকের সঙ্গে হিন্দু সম্মেলন হয়েছে।

এই সময়েই গুজরাটের সুবীর নামে এক গ্রামে স্বামীজী গিয়েছেন। সেখানে এক পরিচিত বনবাসী এসে স্বামীজীকে বলল, অল্প কিছু দূরে একটা টিলা আছে। এখানকার লোকে ওই টিলাকে চমক ডোগরী বলে। সেখানে শবরী মাতা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ফল খাইয়েছিলেন। কখনো কখনো একটা জ্যোতি ওই টিলার থেকে উপরে যেতে দেখা গেছে। প্রচলিত বিশ্বাস, শবরী মাতা জ্যোতি হয়ে স্বর্গে গিয়েছেন। এই কারণে লোকে ওই ডোগরিকে চমক ডোগরি বলে। বনবাসী বন্ধুটির কথা শুনে স্বামীজী তারই সঙ্গে চমক ডোগরিতে গেলেন। সেই টিলার উপর তিনটে শিলাখণ্ড রয়েছে। জনশ্রুতি হলো, এই তিনটি শিলাখণ্ডের একটিতে শ্রীরাম ও দ্বিতীয়টিতে লক্ষ্মণ বসেছিলেন। আর তৃতীয় শিলাখণ্ডে শবরী মাতা বসে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে ফল খাইয়েছিলেন। স্বামীজী এই পবিত্র স্থলে একটি মন্দির নির্মাণের সংকল্প করলেন। শবরী মাতার একটি মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করা হলো। পূজার্চনা শুরু হলো। ভক্তরা যাতে বহু সংখ্যায় মন্দিরের সম্মুখে সমবেত হতে পারে তার জন্য টিলা কেটে সমতল তৈরির চেষ্টা হলো। ২০০২ সালে সেইখানে মুরারিবাপুর রামকথা গানের আয়োজন হলো। টিলার নীচে পাঁচ হাজার লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে এমন কাঠামো তৈরি হলো। সন্ত ভুর বাপু ও তাঁর গোষ্ঠীর উপর ভোজন ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হলো। সব মিলিয়ে শবরী ধাম এক তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের পর স্বামীজী এবার মধ্যপ্রদেশের দিকে

মন দিলেন। বিশেষত, মধ্যপ্রদেশের ধার, ঝাবুয়া, আলিরাজপুর জেলার বনবাসী এলাকাগুলিতে। ওইসব গ্রামের মানুষের সঙ্গে তিনি মাসাধিককাল থেকেছেন। ঝাবুয়া অঞ্চলের গ্রামগুলিতে তিনি ঘরে ঘরে মন্দির তৈরির পরিকল্পনা করেন। ঘরে ঘরে হনুমানজীর ছবি লাগানো হয়। হনুমানজী বা অন্য দেবদেবীর ছবি সংবলিত লকেট মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইন্দোর শহরের প্রায় পাঁচশো যুবক-যুবতীকে এই লকেট বিতরণের জন্য বনবাসী গ্রামগুলিতে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়। এইসব গ্রামে একাকীই যেতে হবে। বনবাসী পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এইরকম যখন কথাবার্তা চলছে তখন একজন কলেজ ছাত্রী তাদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলল। সেইসময় ঝাবুয়াতে এক মিশনারি নানকে ধর্ষণ করা নিয়ে খুব শোরগোল চলছিল। স্বামীজী তখন বলেছিলেন, বনবাসী অঞ্চলে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সুরক্ষার গ্যারান্টি তিনি নিজেই দিচ্ছেন। আপনার কিছুই হবে না। স্বচ্ছন্দেই যেতে পারেন। তবে ইন্দোর শহরে আপনার সুরক্ষার গ্যারান্টি অবশ্য তিনি দিতে পারবেন না। স্বামীজীর এই তেজোদৃপ্ত প্রত্যুত্তরে কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে গেল। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে বনবাসী গ্রামগুলিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জাগরণের কাজ করতে লাগলেন। ঝাবুয়া জেলার প্রায় সব পরিবারেই হনুমানজীর ছবি শোভা পেতে লাগল। ২০০৪ সালে ঝাবুয়াতে বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৫ লক্ষ বনবাসী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন আর এস এসের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শন।

আমাদের দেশের বনবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে মানুষের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান ও মুসলমানরা তাদের নিজেদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করছিল। এই ধর্মান্তরণের লক্ষ্য ছিল শুধু ধর্মান্তরিতদের উপাসনা পদ্ধতিরই পরিবর্তন নয়, সেই সঙ্গে তাদের জাতীয়তারও পরিবর্তন। অর্থাৎ এদেশের মানুষকেই ধর্মান্তরণের মাধ্যমে দেশের শত্রুতে পরিণত করা। এই ধর্মান্তরণ তাই অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার বলে হিন্দু সমাজের সচেতন মানুষেরা মনে করেছিলেন। আর তার প্রতিরোধের জন্য ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে গুজরাটের ডাংস জেলার সুবীর গ্রামে শবরী ধামে শবরী কুম্ভের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনদিন ধরে চলা এই কুম্ভে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন। এটা ছিল হিন্দুর অধিকার রক্ষার স্বার্থে হিন্দু ঐক্যের প্রদর্শন।

সামাজিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাধু-সন্তরা এই কুম্ভে যোগ দিয়ে মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেছিলেন। যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার অর্থাৎ 'ঘর বাপসী'র পরামর্শ দিয়েছিলেন। শবরী কুম্ভের বিশাল মঞ্চের পিছনে ছিল বিশাল চিত্র— যেখানে শ্রীরামচন্দ্র দশানন রাবণের দিকে শর নিক্ষেপ করছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, রামের কাছ থেকে বনবাসীদের আলাদা করে দেওয়ার যে কোনো চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

হিন্দু সমাজের সুরক্ষার জন্য তাঁর এই আপোশহীন সংগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৫ সালে কলকাতা বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে স্বামী অসীমানন্দজীকে 'স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে' ভূষিত করা হয়। ওই বছরই ১০ ডিসেম্বর জয়পুরে শঙ্কর স্মৃতি সমিতি স্বামীজীকে 'শ্রীগুরুজী সেবা সম্মান' দিয়ে সংবর্ধনা জানায়। ফলে সারা দেশে বনবাসী ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার ভাব নির্মাণ হয়। স্বামীজী মনে করতেন, ধর্মান্তরকরণের ভাবনাকে সমূলে বিনষ্ট করে দেওয়া দরকার। তিনি লোকেদের সামনে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলতেন, আপনারাই বলুন, যেখানে ১০০ মুসলিম পরিবারের মধ্যে ১টি হিন্দু পরিবার থাকে সেখানে ওই হিন্দু পরিবারটির কি দশা হয়? আর অন্যদিকে তাকিয়ে দেখুন, ১০০ হিন্দু পরিবারের মধ্যে ১টি মুসলিম পরিবার থাকলেও তাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরাম নিজেই রাবণ বধ করেছিলেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ নিজে অস্ত্র ধারণ করেননি, কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে ছিলেন। আর কলিযুগে জগন্নাথদেব নিজে কিছুই করেন না, কেননা তাঁর হাতই তো নেই, তিনি শুধু দ্রষ্টা। এমনকী তাঁর চোখের পলকও পড়ে না। আন্দামান-নিকোবর ও গুজরাটের ডাংসে কাজ করায় স্বামীজী নিজেই সমাজ জাগরণ কাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আবার মহারাষ্ট্রের নন্দওয়ার, নাসিক, ধুলিয়া জেলায় সমাজকে সঙ্গে নিয়েই সেই কাজ করেছেন। মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়াতে সমাজকে সামনে রেখে জাগরণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর ঝাবুয়াতে যে বিরাট হিন্দু সম্মেলন হলো, সেখানে তাঁকে কোথাও দেখা গেল না। পাশের গ্রামের একটি দলের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন। আবার তাদের সঙ্গে ফিরে গিয়েছেন। শবরী কুম্ভের সময় তিনি সমাজকে সামনে রেখে নিজে পিছনে থেকে কাজ করেছেন। শবরী কুম্ভের সময়ও কোথাও তাঁকে দেখা যায়নি। বনবাসী সমাজের মধ্যে থেকেই নেতৃত্ব নির্মাণ করে হিন্দু জাগরণের কাজ করে গিয়েছেন।

এদেশে কেন্দ্র সরকারে আসীন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক দলগুলি স্বামীজীর কাজকে অনেক চেষ্টা করেও রুখতে পারেনি। বরং ডাংস ও ঝাবুয়াতে তা করতে গিয়ে তাদের নিজেদের মুখ পুড়েছে। শেষপর্যন্ত পি চিদাম্বরম ও দিগ্বিজয় সিংয়ের মতো কংগ্রেসীরা 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' 'গৈরিক সন্ত্রাস' তত্ত্ব তৈরি করে স্বামীজীকে দমন করার ষড়যন্ত্র করেছে। হিন্দু সন্ত্রাসবাদের মাস্টার মাইন্ড হিসেবে স্বামীজীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই কংগ্রেস-চালিত ইউ পি এ সরকার গ্রেপ্তার করতে পারে— এই আশংকা তিনি করেছিলেন।

তাঁর আশংকা সত্য হয়েছিল। তাঁর বয়স তখন প্রায় ষাট। অত্যাধিক পরিশ্রমে শরীরটাও তেমন ভালো যাচ্ছে না। একটু বিশ্রামের আশায় তিনি হরিদ্বারের কাছে একটা গ্রামে গিয়ে উঠলেন। আর এর কিছুদিন পরেই ২০১০ সালের নভেম্বরে সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে রাখা হয় হায়দ্রাবাদ জেলে।

মায়ের সঙ্গে।

অসীমানন্দের গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে চার্জশিটে যেসব অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল খুন, খুনের চেষ্টা, ক্রিমিন্যাল কন্সপিরেসি, রাষ্ট্রদ্রোহ— মোট পাঁচটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা যাতে ১১৯ জন নিহত হয়েছিল। কিন্তু এসবই ছিল অভিযোগ, আইন মাফিক তাকে অভিযুক্ত করা হয়নি (but not yet formally accused)। এসব অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি হতো মৃত্যুদণ্ড।

'Caravan'-এর প্রতিবেদক ২০১৪ সালের জানুয়ারি, স্বামী অসীমানন্দর সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎকারে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি সাক্ষাৎ করতে গেলে স্বামীজী তাকে চা-খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তার উত্তর দেওয়ার আগেই সামান্য অপরাধে বন্দি এক কিশোর প্লাস্টিকের কাপে চা এনে তাঁকে দেয়। অসীমানন্দ সেই কিশোরটিকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, 'এটা আমার ছেলে। ক'দিনের মধ্যেই ও ছাড়া পাবে।' তারপর কিশোর ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে বলেন, 'এই চা-ওয়ালা একদিন নরেন্দ্র মোদী হয়ে উঠতে পারে।'

সাক্ষাৎকার চলার সময় জেল অফিসার মাঝে মধ্যেই কথাবার্তায় বাধা দিয়ে অসীমানন্দকে বলছিলেন— তিনি কী করছেন? অসীমানন্দ বলছিলেন— 'জেলে থাকার সময় তাঁরা সবাই আমাকে বলছেন যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে ('They all tale me 'Jo hua accha hua')।

দীর্ঘ সাত বছর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেও তিনি নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন। সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই, হিন্দু সন্ত্রাস-এর ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ফাঁস হবেই— এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। শেষপর্যন্ত সত্য— তাঁর বিশ্বাসেরই জয় হয়েছে। দেশের আদালত তাঁকে সব অভিযোগ থেকে নিঃশর্তে মুক্তি দিয়েছে।

মুক্তির পর মাত্র একদিনের জন্য তিনি তাঁর মাতৃদেবীকে প্রণাম করার জন্য কামারপুকুরে এসেছিলেন। মা তাঁকে জানিয়েছিলেন— 'সত্যের জয় হলো। তিনি এবার শান্তিতে মরতে পারবেন।' তখনই তাঁর সঙ্গে এই লেখকের ফোনে কথাবার্তা হয়েছিল— মুখোমুখি দেখা হয়নি। সেই সময় স্বস্তিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন— 'হিন্দু বিরোধীদের সর্বশক্তি দিয়ে পরাজিত করতে হবে। যে কাজ গোড়া থেকেই করছি, সে কাজই করে যাব। সন্ন্যাসী আছি এবং থাকবও।' মুক্তির পর কোনো সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎকার (স্বস্তিকা, নববর্ষ সংখ্যা, ১৪২৬; ১৫ এপ্রিল, ২০১৯)।

স্বস্তিকা এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এরপরও আর (রিপাবলিক) ভারত, সুদর্শন চ্যানেলে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। তিনি যে এক আপোশহীন সংগ্রামী ও একই সঙ্গে সন্ন্যাসী— এইসব সাক্ষাৎকারে সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অসীমানন্দ এখন অসীম আনন্দের সন্ধানে এক যোদ্ধা সন্ন্যাসী।

তথ্যসূত্র :

১। পূজ্য স্বামী অসীমানন্দজী মহারাজ এক ব্যক্তিত্ব— জগদেওরাম ওরাঁ, সর্বভারতীয় সভাপতি, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম।
২। 'The Caravan' পত্রিকা, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।
৩। সুকুমার সরকার (সম্পর্কে দাদা)।
৪। স্বাগতা সরকার (সম্পর্কে ভাইঝি)।
৫। স্বস্তিকা, নববর্ষ সংখ্যা, ১৪২৬ (১৫.৪.২০১৯)।
৬। বলরাম সাঁতরা (বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রাক্তন পূর্ণকালীন কার্যকর্তা)।

With Best Compliments
from :-

A

Well

Wisher

মোদীকে সম্মানিত করছেন সৌদি আরবের সুলতান।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এক জাতি এক দল এক নেতা

সুজিত রায়

সযত্নে ট্রিম করা দাড়ি। চোখে রিমলেস চশমা। আধুনিক শুধু নয়, অত্যাধুনিক মোদী কোট আর ঝকঝকে নিখুঁত ইস্ত্রি করা কুর্তা-চোস্তায় সজ্জিত নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদীর মূর্তি ফুটে ওঠে থ্রি ডি প্রযুক্তিতে। সরাসরি ভোটারদের দরজায় পৌঁছে যাচ্ছেন। প্রশ্ন করছেন, 'আপনারা কি সত্যি মনে করেন আমি মৃত্যুর সওদাগর?' সমবেত কণ্ঠে জনগণের জবাব আসছে— 'না'। ফেসবুক, টুইটারে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা দু'কোটি। নিজস্ব ওয়েবসাইট, ব্লগ সবই নিয়মিত আপডেটেড। অত্যাধুনিক ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্নের ফেরিওয়ালার প্রচারে নিয়োজিত মার্কিন জনসংযোগ সংস্থা অ্যাপকে

ওয়ার্ল্ডওয়াইড। আর মোদীর সরাসরি জনসংযোগ হ্যাংগ আউট। প্রগতির প্রতিরূপ, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতীক, পুরুষকারের উজ্জ্বল নজির নরেন্দ্র মোদী বলছেন— 'সৌগন্ধ মুঝে ইস মিট্টি কি, ম্যাঁয় দেশ নেহি মিটনে দুঙ্গা, ম্যায় দেশ নেহি ঝুঁকনে দুঙ্গা।' ব্র্যান্ড মোদীর ঝকঝকে শিলমোহরে মিশছে সুর— 'মেরী ধরতি মুঝসে পুছ রহি, কব মেরা কর্জ চুকাওগে, মেরী অম্বর মুঝসে পুছ রহি, কব আপনা ফর্জ নিভাওগে... হাঁ ম্যাঁয়নে কসম উঠাই হ্যায়, ম্যাঁয় দেশ নেহি বিকনে দুঙ্গা।' বলিউডের তিন নক্ষত্র প্রসূন যোশী, আদেশ শ্রীবাস্তব আর সুখবিন্দর সিং-এর সৃষ্টিতে বুঁদ মিডিয়া। টেলিভিশন স্ক্রিনে, এফ এম চ্যানেলে, বিলবোর্ড, হোর্ডিং-এ, মোবাইল স্ক্রিনে স্যোশাল মিডিয়ার পাতায় পাতায় একটাই বার্তা— 'অব কি বার, মোদী সরকার।'

বিজেপি নয়, মোদী সরকার। বিজেপির মতো সংগঠিত দল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো রেজিমেন্টেড একটি সামাজিক সংগঠন— সব কিছু ছাড়িয়ে ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে হাত নাড়ছেন নরেন্দ্র মোদীর কাটআউট। গান্ধীজী, বল্লভভাই প্যাটেল, নেহরু, ইন্দিরা, নরসিমা--- কেউ নেই কোথাও। অবিশ্বাস্য এবং অবিস্মরণীয়। এমন ৩৬০ ডিগ্রি প্রচারাভিযানে কি চমকে যায়নি কর্পোরেট ব্র্যাণ্ডগুলিও?

হ্যাঁ, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের চমকটা ছিল এমনই। চাহিদা ছাড়া কোনো প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড ইমেজ সাফল্য পায় না। মোদী যদি হন সেই ব্র্যান্ড ক্যাম্পেনের প্রোডাক্ট আর যদি সেই ক্যাম্পেন সাফল্য পায় তাহলে তো মেনে নিতেই হবে— মোদীর সাফল্য তাঁর চাহিদা থেকেই। চমকে গিয়েছিলেন তাঁরাও যাঁরা এতদিন সর্ষের মধ্যে ভূত দেখেছেন। যাঁরা এতদিন অন্ধের মতো বিশ্বাস করে এসেছেন, নরেন্দ্র মোদী 'মওত কী সওদাগর'। রহস্যটা কোথায়? মোদীর হাতে কি ছিল আলাদিনের কোনো আশ্চর্য প্রদীপ? নাকি কোনো জাদুদণ্ড, যার মায়াবী ছোঁয়ায় 'বিনাশপুরুষ' রাতারাতি 'বিকাশপুরুষ' হয়ে গেলেন?

না— এ ছিল 'মোদী ম্যাজিক' যার পিছনে ছিল মোদীর জীবনের পঞ্চাশ বছরের সাধনা, ভাবনা, ইচ্ছে, সততা আর পরিকল্পনা। সেটাই মোদী ম্যাজিক। এবং এক ঝটকায় কুপোকাত এতদিনের ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার জপমালাধারী যত্ত সব ভণ্ড রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত। মোদীর ইউ এস পি বা ইউনিক সেলিং প্রোপাজিশন ছিল সেটাই যার স্লোগান ছিল— 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। ১৯৯১ আর ১৯৯৬ থেকে একেবারে প্যারাডাইম শিফ্ট। তখন মোদী ছিলেন না। ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট ছিলেন রাম। স্লোগান ছিল— 'আপকা ভোট রাম কে নাম।' হ্যাঁ, স্লোগান ছিল— 'হাম সৌগন্ধ রাম কী খাতে হ্যাঁয়, মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে।' ২০১৪ সালে মোদী বুঝেছিলেন— রামের নাম ভাঙিয়ে আর জনগণকে বশে রাখা যাবে না। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে। তাই আর এস এসের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও বলে দিয়েছিলেন— 'দেবালয় সে শৌচাগার জরুরি হ্যায়।' এখন ভারতবর্ষে দরকার উন্নয়ন। আক্ষরিক অর্থে উন্নয়ন— চাষের ক্ষেতে জল, গ্রামের বুকে রাস্তা, চাকরির জন্য কলকারখানা। কলকারখানার জন্য বিদ্যুৎ, শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ, স্বাস্থ্যের জন্য পরিচ্ছন্নতা, দূষণ বিরোধী শৌচালয় আর রান্নাঘর, বেঁচে থাকার জন্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর একজন মডেল— রোল মডেল।

রোড মডেল হয়েই ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে তিনি ভারতবর্ষের সামনে এক বিশ্বাসের জন্ম দিতে পেরেছিলেন— মেলাবেন, তিনি মেলাবেন। মেলাবেন আসমুদ্র হিমাচল উন্নয়নের জোয়ারে। না ভর্তুকির উন্নয়ন নয়, সেই উন্নয়ন যা জীবনকে চিনতে শেখায়। জীবনের পাঠশালায় প্রত্যাশী ছিলেন সকলেই— জোতদার, জমিদার, কৃষক, শ্রমিক, কারখানা মালিক, খুচরো ব্যবসায়ী, বিদ্বজ্জন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বেকার, ছাত্রছাত্রী, গৃহবধূ, চাকুরিজীবী, মুটে, মজুর, ধর্মপ্রাণ পুরোহিত, মৌলানা, বিশপও।

যতই চিৎকার হোক না কেন, তাঁর শ্রেণী চরিত্র এবং গণচরিত্র নাকি ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর— হ্যামলিনের বাঁশির সুরে ভেসে গেছে সব চিৎকার, সব স্লোগান, সব অভিযোগ-অনুযোগ। মানুষ 'আচ্ছে দিন'-এর প্রতীক্ষায় ছিল— সেই 'আচ্ছে দিন' মানে শুধু রাজনীতির স্থিতিশীলতাই নয়, অপশাসন, কুশাসন, অর্থনীতির অবনমন, মূল্যবৃদ্ধি, লাগামছাড়া দুর্নীতির চাপে রিক্ত, জর্জরিত, অবসাদগ্রস্ত দেশকে বিকাশের সুফল পৌঁছে দেওয়া।

না, সবটা পূরণ হয়নি। ২০১৪ থেকে ২০১৯— অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে আচমকা নোটিশে কোটি কোটি কালো টাকাকে নিঃশেষ করে দেওয়া, কর আদায়ে নতুন চিন্তাভাবনা— জি এস টি-র প্রবর্তন ইত্যাদি ইস্যুগুলিকে হাতিয়ার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কিছুটা হলেও ফয়দা তুলেছিল। কিন্তু মানুষকে ভুল বোঝানোর কৌশল ফুৎকারে উড়ে গেছে। কারণ এ ধরনের যুগান্তকারী অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফল আটকে রাখা যায়নি। সত্যটা সামনে আসতেই কেটে গেছে কুহেলিকা। এ বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল। স্বপ্নের ফেরিওয়ালার দৃঢ় অঙ্গীকার— প্রায় যতদূর ভালো মানবসমাজ গড়ে দিয়ে যাব, সার্থক হলো।

২০১৪ থেকে ২০১৯--- টানা পাঁচ বছরের নানা টানাপোড়েনের পর যখন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ল, মনে হলো যেন কোনো মন্ত্রপূত জলের ছোঁয়ায়

আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বসল ভারতবর্ষের সব বিরোধী দল। সেই একই বস্তাপচা স্লোগান— 'খুনি মোদী আর না', 'দাঙ্গাবাজ মোদী আর না', 'আদানি-আম্বানিদের কাছে দেশকে বেচে দেওয়া মোদী আর না'।

ক'দিন আগেই বিজেপি গোহারান হেরেছে হিন্দি বলয়ে— উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থানে, ছত্তিশগড়ে। বিরোধী শিবির ছত্রভঙ্গ হয়েও উজ্জীবিত— এবার মোদীর ব্র্যান্ড ইমেজকে বাঁচায় কে দেখতে চাই। তার ওপর একটার পর একটা অবিশ্বাস্য অভিযোগ— রাফালে দুর্নীতি, পুলওয়ামার সেনা হত্যা, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি এবং জালিয়াতদের ফেরার হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। দৃশ্যত ভারতবর্ষ বিভ্রান্ত। শ্যাম রাখি না কুল রাখি— ভাবতে ভাবতেই ঘোষণা হয়ে গেল নির্বাচনী নির্ঘণ্ট। এবং ২০১৪ সালে মোদীর দুরন্ত প্রচার কৌশলকে টেক্কা দিতে বিরোধী শিবির তোলপাড় হয়ে উঠল ভোটব্যাঙ্কের সমঝোতা গড়ে তুলতে। সবচেয়ে বেশি লম্ফঝম্প করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ তাঁর সখ হলো, এবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন আর রাজ্যে তার চেয়ারে বসিয়ে যাবেন ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অতএব সপা, বসপা, আর জে ডি সহ দেশের যত বিরোধী দল সবাইকে টেনে আনলেন ব্রিগেডের মঞ্চে 'এক সাথে গাহি গান'-এর মন্ত্রে দীক্ষিত হতে। একজোট না হলে এবার মোদীকে হারানো সহজ ছিল না। কারণ নোটবন্দি, জি এস টি, রাফাল, পুলওয়ামা— কোনোটাই বিরোধীদের অস্ত্রে শান দিতে পারেনি। অতএব টেনিস কোর্টের একদিকে থাকুক মোদী একা, অন্যদিকে বাকি সবাই। ব্যাপারটা যে জলবৎ তরলং ছিল না— মমতা সেটা বুঝে গেলেন দু-একদিনের মধ্যেই। আর মমতার অঙ্কটাও ধরে ফেললেন ধড়িবাজ শরদ পাওয়ার, সপা, আর জে ডি-র নব্য কর্ণধার তেজস্বী সহ সকলেই। সুতরাং ওপর ওপরে 'একসঙ্গে আছি' বাতাটা পৌঁছালেও জনগণ বুঝে নিল শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলিটা হবে না। তার ওপর তখনই ফাটলো মোদী বোমা— 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' শ্লোগানের সঙ্গে জুড়ল আরও দুটি মোক্ষম শব্দ 'সবকা বিশ্বাস।'

ভোটের আগে থেকেই হাওয়াটা বোঝা যায়নি তা নয়। যদিও এবার 'ব্র্যান্ড মোদী' ইমেজের পিছনে ছিল না কোনো বিশেষজ্ঞের হাত। নিজেই ছিলেন নিজের তথা দেশের ভাগ্য নির্ধারক। দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় নয়। বিশেষ করে বিজেপির মতো কঠোর সংগঠনে। কিন্তু না। এবার বিজেপির ভোট হয়েছে মোদীর নামে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর দেওয়া তকমা 'চৌকিদার' নিজের গায়ে সেঁটে সর্বত্র ভোট ভিক্ষা করেছেন মোদীজী। যত প্রার্থী, যত নেতা, যত কর্মী সব রাতারাতি দায়িত্ব নিয়েছেন দেশরক্ষার চৌকিদার হিসেবে। একটা ৭০ বছরের মানুষ এক মাসেরও কম সময়ে এক লক্ষ পাঁচ হাজার কিলোমিটার পরিভ্রমণ করে ১৪২টা নির্বাচনী সমাবেশে পৌঁছে গেছেন এই কঠোর গ্রীষ্মের দাবদাহকে উপেক্ষা করে। কারণ মোদীজী বুঝেছিলেন— বিরোধীদের এবারে নির্বাচনের কৌশল ছিল বিজেপি বিরোধিতা নয়, মোদী বিরোধিতা। মোদীর বিরুদ্ধে প্রচার চালাও। মোদীকে অপমান কর পদে পদে। মানুষের সামনে ২০১৪ সালের আকাশছোঁয়া মানুষটাকে যেভাবে

তিন তালাক বিরোধী বিল পাশ হওয়ার পর মুসলমান মহিলাদের আনন্দ।

পারো টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনো। মাথা নিচু করে দাও। পুরনো স্লোগান 'মওত কী সওদাগর নরেন্দ্র মোদী' ধ্বনিকে ফিরিয়ে আনো। মোদীজীর কাছে এটা ছিল চ্যালেঞ্জ। তাই নির্বাচনটা দলের নয়, হলো নিজের নামে। মোদীর নামে। নতুন ব্র্যাণ্ড আইকন। গেরুয়া ঝড়ে ভেসে গেল দেশ। বিজেপি একাই ৩০৩। মোদী একাই একশ পেরিয়ে হাজার।

অভাবনীয়। কিন্তু সত্যি। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে বিজেপি প্রায় মুছে গিয়েছিল সেখানে ৮০ আসনের ৫৯টি মোদীজীর দখলে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ফের হাতের মুঠোয়। ঝাড়খণ্ডেও নয় নয় করে ছটা আসন। উত্তর-পূর্ব ভারত প্রায় গোটাটাই। ওড়িশাতে, বাংলাতেও অভাবনীয় সাফল্য। যারা এক্সিট পোল সমীক্ষা করেছিলেন তাদেরও সবার মুখ উজ্জ্বল। পশ্চিমবঙ্গের ঘাসফুল মুখ ঘষছে মাটিতে। আর নতুন দিনের ভোরে দীঘি আর পুকুরের জলে জলে হাসছে গেরুয়া পদ্ম। বাংলা ছিল মোদীজীর কাছে এবার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অশালীন নির্বাচনী প্রচারের জবাব দিতে তাই মোদীকে বারে বারে আসতে হয়েছে। দলের সভাপতি অমিত শাহকে পাঠাতে হয়েছে বারে বারে। আর মমতার তিক্ত ভাষণের জবাবে ততোধিক তীক্ষ্ণ হয়েছেন মোদীজী। না, ভাষায় নয়। কৌশলে। এবং শেষ পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক পটচিত্রে ফুটে উঠেছে অন্য ছবি— যে ছবির নাম 'পরিবর্তন।'

এমন একটা নির্বাচনী ফলাফল যতটা আনন্দের ঠিক ততখানিই দুঃশ্চিন্তার। দুঃশ্চিন্তার, কারণ মানুষের প্রত্যাশার চাপ। মোদীজী— তোমার কথায়, তোমায় ভোট দিয়েছি অকাতরে। নোটবন্দি ভুলে গেছি, জি এস টি ভুলে গেছি। কৃষকের আত্মহত্যা ভুলে গেছি। রাফায়েল দুর্নীতি ভুলে গেছি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায়মান চিত্তকে বগলচাপা দিয়ে শুধু তোমার কথা শুনেছি। তোমার কথায় দেশকে ভালোবেসেছি। তোমার কথায় সন্ত্রাসবাদ আর সন্ত্রাসবাদের জননী-জঠর পাকিস্তানকে ঘৃণা করতে শিখেছি। এবার আমাদের চাওয়ার পালা।

এতে অন্যায় কিছু নেই। এটা আবদার নয়। অধিকার। কিন্তু মানুষের এই অধিকারে মোদী সাড়া দেবেন কোন অধিকারে?

উত্তর একটাই 'এক জাতি, এক দল, এক নেতা'র অধিকারে। একথা বলার কারণ ২০১৯-এর নির্বাচনী ফলাফল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতিপথের এক নতুন দিশা, এক নতুন নিশানা। আগামী দিনে ভারতবর্ষের সমাজ, ভারতবর্ষের রাজনীতি, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি হাঁটবে এক নতুন পথে যে পথে পরম্পরার ঐতিহ্য থাকবে অক্ষুণ্ণ অথচ আধুনিকতাকে বরণ করে নেওয়ায় কোনো আন্তরিকতার অভাব হবে না। আগামী দিনের ভারতবর্ষ মানে — এক জাতি, এক প্রাণ, এক জাতি, এক আইন, এক দেশ, এক দল এবং অধিকারের ভারতবর্ষ। আরও বড় সত্য— আগামী দিনের ভারতবর্ষ এক জাতি এক নেতার ভারতবর্ষ। ২০১৪ যা পারেনি, ২০১৯ তা পেরেছে। ভারতবর্ষের মানুষের সচেতন ভারতবর্ষ ২০১৯-এ প্রমাণ করেছে— বিস্মৃতির অভিশাপ কাটিয়ে ভারতবাসী জাতীয়তাবাদকে ফের চিনে নিতে পেরেছে। নিজস্ব সত্তা হিন্দুত্বকে চিনতে পেরেছে। ভারতবাসী নিজের প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পেরেছে। সুতরাং একথা সুনিশ্চিত, আগামী দিনে ভারতবর্ষের মানুষ হাঁটবে সবাই হাতে হাত ধরে এক লক্ষ্য পথে। আর হাতে হাত মিলনের সেই জাতীয়তাবাদের মন্ত্রধ্বনিতে ছিটকে যাবে আঞ্চলিকতাবাদ। মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা, লঘু এবং সংকীর্ণ ভোটব্যাঙ্ক তৈরির ঘৃণ্য রাজনীতি আর মিথ্যা অধিকারবোধের আস্ফালন। এক জাতি এক প্রাণ ভারতবাসী এবার হাঁটবে একক নেতৃত্বের পায়ে পায়ে আত্মবিভ্রান্তি, আত্মপ্রবঞ্চনা আর আত্মপ্রচারের অভিশাপ মুক্ত হয়ে। সে নেতার নাম নরেন্দ্র নাম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী।

কে এই নরেন্দ্র মোদী, যিনি পরপর তিনবার গুজরাটবাসীর হৃদয় জয় করে গুজরাটকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়ে ২০১৪ সালে জয় করলেন গোটা ভারতকে। আবার ২০১৯ সালে গোটা ভারতবাসীকে? এই প্রশ্নের সামাজিক উত্তর বলে দেবে সবাই। কিন্তু দর্শনের অর্থে? উত্তর একটাই— অপার বিস্ময়। কারণ মোদীর জীবনের প্রতিটা পৃষ্ঠা, তাঁর মুখের প্রতিটা শব্দ, তাঁর হাঁটার প্রতিটা পদক্ষেপ, তাঁর ভাবনাচিন্তার প্রতিটা সূত্র, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর প্রায় নিখুঁত ধারণা, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর জাতীয়তাবাদের ভাবনা, তাঁর রুচি, তাঁর বিশ্বাস— সবই বিস্ময় জাগায়। জাগায়, কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদী এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। কেন ব্যতিক্রমী? কারণ, তিনিই একমাত্র ভারতীয় রাজনীতিবিদ যাঁকে বিরুদ্ধ সমালোচনার তিরে বিদ্ধ হতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। অথচ সেই তিনিই সবাইকে পিছনে ফেলে ভারতবাসীর কাছ থেকে স্বর্ণহার উপহার পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অপরাধ না করেও 'মৃত্যুর সওদাগর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, কিন্তু ক্ষমা চাননি। বলেছেন, 'কিসের ক্ষমা? আমি অপরাধী হলে আমায় ফাঁসিতে ঝোলানো হোক।' কারণ, তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি বলতে পারেন 'আমার কোনো পরিবার নেই। চুরি করব কার জন্য?' কারণ, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি রাজনৈতিক গুজবের সবচেয়ে বড় শিকার, অথচ তাঁর জীবনে ঠাঁই পায়নি প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ। 'বিস্ময় পুরুষ' বলেই তাঁকে বুঝতে ভুল হয়। চিনতে ভুল হয়। রাগ হয়। হিংসা হয়। আর যাঁরা বুঝে যান, তাঁরা বিস্মিত হন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে। কত মিথ্যে রটনা— সন্ন্যাসী হয়েও তিনি গোমাংস খান, বেশ্যাবাড়িতে রাত

জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে মোদী ও ট্রাম্প।

কাটান, বিদেশিনীদের নিয়ে পার্টি করেন, মদে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন রাস্তাঘাটে, মঠের নামে বাগানবাড়ি বানালেন— আরও কত কী? স্বামীজী তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বলেছেন, যীশুখ্রিস্টের সুরেই—' প্রভু তাঁদের আশীর্বাদ করুন। ভ্রাতৃগণ, কোনো ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষপর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য হয়।'

নরেন্দ্র মোদীও হেঁটেছেন একই পথে। বলেছেন, 'I am a detached person'। ন্যাংটার আবার বাটপারের ভয়! তাই ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আগে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রাহুল গান্ধী যখন ভোটে হেরে গেলে মোদী কী করবেন বলে প্রশ্ন তুলেছিলেন, মোদী নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন— 'আমি তো চা বিক্রি করেই পেটের ভাত জুটিয়ে নেব। আপনি কী করবেন, ভেবে নিন।' গুজরাটের খাঞ্জি পরিবারের চাওয়ালার অতীতকে লুকোননি মোদী। তাই প্রথমবারে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার আগে বিজেপি সংসদীয় দলের সভায় নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছিলেন— 'আমার মতো গরিব ঘরের কেউ যে এখানে এসে পৌঁছাতে পারল এটাই ভারতীয় গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য।' না, মোদী নিজেকে মহান করেননি। মহান করেছেন দেশের গণতন্ত্রকে।

মা বলে সম্বোধন করেছেন নিজের দেশ আর দলকে। প্রধানমন্ত্রীর পদকে 'পদ' বলে আখ্যা না দিয়ে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী কোনো পদ নয়, দায়িত্ব। আমি পদে নয়, দায়িত্বে বিশ্বাসী।'

দায়িত্বে বিশ্বাসী বলেই দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দলীয়ভাবে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন মানুষের। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশের' সঙ্গে 'সবকা বিশ্বাসটা'ও আদায় করে নিয়েছেন সবাইকে পিছনে ফেলে। ভারতবর্ষের ২৪২৫টি ছোট বড় নানা মত নানা পরিধানের রাজনৈতিক দলগুলির মুখে চুনকালি মাখিয়ে মেরুকরণের রাজনীতিকেও পিছিয়ে দিয়েছেন অনেকটাই। হিসাব যেখানে বলছে এনডিএ ৩৫৭, বিজেপি একাই ৩০৩, ইউ পি এ ৯৭, কংগ্রেস এককভাবে ৪৯, তারপর আর 'মেরুকরণ' শব্দটা ব্যবহার করা যায় কীভাবে? সুতরাং নিশ্চিত হয়ে গেছে— ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এক জাতি এক নেতা তত্ত্বের অভিমুখী। অথবা আরও একটু স্পষ্ট করেই বলা যায়— 'এক জাতি এক নেতা একতা' তত্ত্বের অভিমুখী।

এমন নেতা কী সত্যিই পেয়েছে ভারতবর্ষ? এর আগে? কখনো? যিনি জোর গলায় বলতে পারেন, আমি গর্বিত। আমি হিন্দু। যিনি জোর গলায় বলতে পারেন, ভারতবর্ষ ভারতবাসীর, অনুপ্রবেশকারীর নয়। যিনি পাক-সন্ত্রাসবাদের জবাব দিতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে বোমা ফেলে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি ধ্বংস করে পাক প্রশাসনের গালে সপাটে থাপ্পড় মারতে পারেন। যিনি চীনকে বাধ্য করেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাক সন্ত্রাসবাদী

মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে মেনে নিতে। যিনি পারেন গোটা বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের লড়াইকে সমর্থন জানাতে। যিনি কালোবাজারি রুখতে একরাতেই নিকেশ করে দেন কালো টাকার সব খেলা। যিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা রাফাল দুর্নীতির অভিযোগে জবাব দেন, এটা প্রমাণ করেন যে গোটা অভিযোগটাই ছিল সাজানো। যিনি মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জাগাতে পারেন, চলতি বছর থেকেই ধাপে ধাপে এগোবে ভারত এবং ২০৩০ সালে ভারত হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। যিনি মানুষের মনে নির্ভরতা জাগাতে পারেন, ভারতবর্ষ থেকে দুর্নীতি বিদায় নেবেই। দেশ এগোবে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সামাজিক সুরক্ষায়। দেশের মেয়েরাও হয়ে উঠবে দেশের সম্পদ। যিনি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কিন্তু দেশের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের বেআইনি অনুপ্রবেশকে রুখতে কঠোরহস্ত। যিনি মনে করেন, যুবশক্তির উন্নয়ন মানে দেশের বন্ধ্যামুক্তি। সর্বোপরি যিনি হিন্দুত্ববাদী ভাবনার একনিষ্ঠ শরিক হয়েও মনে করেন, দেবালয় নয়, ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে দরকার শৌচালয়। তাঁর হাত ধরেই গোটা দেশ জুড়ে চলে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, আয়ুস্মান প্রকল্প, উজ্জ্বলা প্রকল্প, মুদ্রা যোজনা, স্টার্ট আপ প্রকল্প। আর মানুষের কাছে পৌঁছে যান 'মন কী বাত' রেডিও অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে। সরাসরি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে।

আগামী পাঁচ বছর ভারত হবে একদল (এন ডি এ-র উপস্থিতিকে মান্যতা দিয়েই) এক নেতার প্রশাসন। অন্য দল অন্য নেতৃত্ব ধীরে ধীরে উবে যাবে জলীয় বাষ্পের মতো। কারণ, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মানুষ বুঝে গেছে, এবার পাল্টানো দরকার। গণতন্ত্রের নামে বুজরুকির শিকার আর হতে চান না মানুষ। এবার 'চলো পাল্টাই' স্লোগান তুলে মানুষ এক দল এক নেতার ওপরেই ভরসা রেখেছে, শুধু বিজেপি এবং মোদীজীর ওপর সম্মান প্রদর্শন করেই নয়, পরোক্ষে মোদীজী এবং তাঁর দলকে এই হুঁশিয়ারি বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মোদীজীই যেমন হবেন পরিবর্তিত ভারতবর্ষের মুখ, তেমনই মোদীজীই বাধ্য থাকবেন মানুষের প্রশ্নের জবানবন্দি দিতে। একদলীয় এক নেতার প্রশাসনের সেটাই পরম্পরা।

তবে সমালোচকরা কিছুটা সংকুচিত। কারণ, তাঁদের অভিজ্ঞতা বলে, বিশ্বে এমন বহু নজির রয়েছে যেখানে এক দলের এক নায়ক একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর শুধুই একনায়ক বা স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসকে পরিণত হয়েছেন। ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে 'এক দল এক নেতা' নীতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে সেই সম্ভাবনাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। অনেক সমালোচক আবার ইন্দিরা গান্ধীর উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, গণদেবতার প্রত্যাশা পূরণের চাপ নিতে না পেরে নিজের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য অসামান্যা প্রতিভাবান প্রশাসক ইন্দিরা গান্ধীও স্বৈরাচারের পথে হেঁটেছিলেন। তার যোগ্য জবাব দিয়েছিল মানুষ।

মোদীজীর ওপর প্রত্যাশার চাপ যথেষ্ট, কারণ এবার ভোটে পরোক্ষ প্রাপ্তিও অঢেল। এই সমালোচনার জবাব একটাই— ইন্দিরার ভারতের সঙ্গে মোদীর ভারতের আকাশ-পাতাল ফারাক। ইন্দিরার ভারত সমাজবাদের শিকলে আবদ্ধ থেকেও বিশ্ব রাজনীতিতে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই লড়েছে। মোদীর ভারত সমাজবাদের বস্তাপচা তত্ত্ব ছুঁড়ে না ফেলেও আজকের বিশ্বায়নের সমাজের পুঁজিবাদকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে না। সুতরাং লড়াইয়ের ময়দানের চেহারাটাই স্বতন্ত্র্য। যাঁরা মোদীকে চেনেন, জানেন, তাঁরা বলেন, মোদী চিরকালই লম্বা রেসের ঘোড়া। তিনি ভালোভাবেই জানেন জনগণের মন্দিরে 'গণদেবতা' থেকে 'গণশত্রু'তে পরিণত হতে বিশেষ সময় লাগে না। জনগণ বড় বেশি অস্থিরমতি।

তবে তিনি যে বিশ্বাস করেন মানুষকে। তাই বলতে পারেন— 'লোকে মনে করে উন্নয়ন হলো সরকারের দায়িত্ব। আমি মনে করি উন্নয়ন হলো জনআন্দোলন। সাধারণ মানুষই উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেন। তাঁরাই উন্নয়ন পরিচালনা ও রূপায়ণ করেন।' তিনি বলতে পারেন— 'Each and every citizen of my state is the initiator, creator, implementor; this is what the citizen is doing and because of that reasons we can actually set a goal'।

মানুষের ওপর এমনভাবে বিশ্বাস অর্পণ করে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার কথা আর কোন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কবে? তিনিই তো ২০১৪ সালে বলেছেন— স্বাধীনতার সময়ে ভারতবাসী চেয়েছিল একটা ভালো সরকার। তারপর ৬৭ বছর কেটে গেছে। ...'but people are still asking - why don't we have good governance in our country?'

ভারতবর্ষ নরেন্দ্র মোদীকে পাঁচ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেছে। তারপর নতুনভাবে নির্ভরতা স্থাপন করেছে। ভারতবাসী পরীক্ষায় বিশ্বাসী, সমীক্ষায় বিশ্বাসী। সেখানে মোদীজী সসম্মানে উত্তীর্ণ।

২০১৯ সালের ভারতবর্ষ এক নতুন ভারতবর্ষ। নতুন প্রশাসন। নতুন রাজনীতি। নতুন চিন্তাধারা। নতুন ভারতবর্ষের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি একটাই— 'এক জাতি এক নেতা'— অবিচ্ছেদ্য দুটি সত্তা। ভারতীয় এবং নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদী।

সনাতন হিন্দুধর্ম ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৮১৭ সালের ১৬ মে। অমাবস্যার দিন। সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে ঠাকুরবাড়িতে যাগযজ্ঞ চলছে। এইরকম সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হলো। পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। কার ঠাকুর কোম্পানির সর্বেসর্বা। শিলাইদহের নীলকুঠি, কুমারখালির রেশমকুঠি, রানিগঞ্জের কয়লাখনি আর রামনগরের চিনির কারখানার মালিক। শিক্ষা ও কৃষির উন্নতি, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচিত্র জনহিতকর কার্যে তাঁর দেশভক্তির পরিচয় বিধৃত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জননী দিগম্বরী দেবী ছিলেন পরমাসুন্দরী। তাঁর মুখের আদলে ঠাকুরবাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মুখমণ্ডল তৈরি হতো। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা। ভোর চারটের সময় উঠে গঙ্গাস্নান, তারপর জপমালা নিয়ে এক লক্ষ জপ, সন্ধ্যায় পঞ্চাশ হাজার হরিনাম।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা দিগম্বরী দেবীর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল লক্ষ্যণীয়। স্বামী দ্বারকানাথ ব্যবসার প্রয়োজনে সাহেববিবিদের সঙ্গে পানাহার করতেন। অনেক কাকুতি মিনতি করেও দ্বারকানাথকে নিরস্ত করতে না পেরে দিগম্বরী দেবী তার প্রতিবাদ করেন।

ভোরবেলা নিদ্রিত অবস্থায় স্বামীকে প্রণাম, কখনো কখনো আত্মীয় স্বজনের দাবি-দাওয়া কিংবা চাকরির উমেদারি করতে স্বামীর কাছে দরবার করা— এছাড়া আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি। শোনা যায়, স্বামীর সঙ্গে দেখা করার পর সাতঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করতেন। এমনকী স্বামী বর্তমান থাকা অবস্থায় একাদশীর ব্রত পালন করতেন।

এই পিতামাতার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শৈশবে তিনি দিদিমা অলকাসুন্দরীকে খুব ভালোবাসতেন। ছেলেবেলায় দিদিমা ছাড়া আর কাউকে জানতেন না। শোওয়া বসা খাওয়া সব তাঁর সঙ্গে। প্রতিদিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে শালগ্রাম শিলার জন্য ফুলের মালা গাঁথতেন, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তে পিতামহীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সূর্যার্ঘের মন্ত্র পাঠ করতেন। মাঝে মাঝে সারারাত দিদিমার সঙ্গে হরিবাসরে কীর্তন শুনতেন। অলকাসুন্দরীর স্বহস্তে তৈরি হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন। হিন্দু স্কুলে যাবার পথে ঠনঠনিয়ার কালীমূর্তিকে প্রণাম করতেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন— 'প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভূজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।'

দিদিমা তাঁকে বলেছিলেন— 'আমার যা কিছু আছে তোমাকেই দেব।' এই বলে একটি বাক্সের চাবি তুলে দেন দেবেন্দ্রর হাতে। পরে সেই বাক্সের ডালা খুলে তিনি পেয়েছিলেন কয়েকটি মোহর। শুধু এই মোহর কয়েকটি নয়, তিনি দিদিমার কাছ থেকে পেয়েছিলেন আরও অনেক কিছু।

পিতা দ্বারকানাথ তখন অর্থ যশ, প্রতিপত্তির শীর্ষে। ব্যবসার প্রয়োজনে সাহেবমেমদের জন্য বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হতো। ছেলে দেবেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই ভোগবিলাসে মত্ত হলেন। দ্বারকানাথ ছেলের আচরণে বিচলিত। যশোরের রামনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা সারদাসুন্দরীর সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিয়ে দিলেন। কাজের মধ্যে রাখলে ছেলের মতিগতি ফিরবে— এই আশায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ভার দিলেন। শেষমেষ বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব বড় ছেলের হাতে তুলে দিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবাসে বেরিয়ে পড়লেন। দেবেন্দ্রনাথের বিলাসের প্রমোদে ডুবে থাকার সময়কাল মাত্র তিন বছর।

১৮৩৬ সাল, দিদিমা অলকাসুন্দরী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বৈদ্য জানালো আর কোনো আশা নেই। রোগীকে আর গৃহে রাখা যাবে না। গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার জন্য সকলে অলকাদেবীকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এলো। অলকাদেবী আরও বাঁচতে চান। অন্তর্জলী যাত্রায় যেতে নারাজ। তিনি বললেন, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনোই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস নে।' কে কার কথা শোনে। নিমতলা শ্মশান। গঙ্গাতীরে একটি চালাঘরে দিদিমাকে রাখা হলো। তিন দিন তিন রাত। সঙ্গে নাতি দেবেন্দ্রনাথ। চালাঘরে চাটাইয়ের উপর বসে আছেন। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় জগৎ সংসার প্লাবিত। সারারাত দেবেন্দ্রনাথের চোখে ঘুম নেই। হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দ জ্যোৎস্না। বিলাসিতার মোহ থেকে মুক্তি। ঐশ্বর্যের বন্ধন থেকে মুক্তি।

দিদিমার শ্বাস উপস্থিত হলো। সকলে ধরাধরি করে দিদিমাকে গঙ্গাজলে নামালো। উচ্চৈঃস্বরে সবাই মিলে বলতে লাগল 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম - গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'— দিদিমা 'হরিবোল হরিবোল' বলতে বলতে আকাশের দিকে আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে পরলোকে চলে গেলেন। দিদিমা যেমন তাঁর ইহকালের বন্ধু তেমনি পরকালেরও বন্ধু। দিদিমা নাতিকে অন্য পথের নির্দেশ দিয়ে গেলেন। দিদিমার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ জ্ঞানমার্গের সাধক। একদিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চা করছেন। অন্যদিকে নেক, হিউম প্রমুখ পাশ্চাত্যের জড়বাদী দার্শনিকদের রচনাবলী পাঠ করছেন। এইসব জড়বাদী দর্শনের মূল কথা হলো—শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার হ্রাসবৃদ্ধি, শরীরের মৃত্যুতে আত্মার লয়। কিন্তু এই মতের সঙ্গে কোনো দিক দিয়েই দেবেন্দ্রনাথের মনের ভাবনার ঐক্য হচ্ছে না।

অন্যদিকে ঠাকুরবাড়িতে ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় পিতা দ্বারকানাথ স্বয়ং ঠাকুরদালানে উপস্থিত। পিতার ভয়ে দেবেন্দ্রনাথ মন্দিরে হয়তো যাচ্ছেন, কিন্তু ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে পড়া দেবেন্দ্রনাথ প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকছেন। এ এক কঠিন ধর্মসংকট। এ শুধু পিতার সঙ্গে পুত্রের মতামতের বিরোধ নয়; এ শুধু বৃদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে তারুণ্যের সংঘাত নয়। এ হলো সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সনাতন ধর্মের জয় ঘোষণা। প্রথা সংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ হিন্দু ধর্মের সংস্কার মুক্তির সূচনা।

এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মুহূর্তে, এই ধর্মসংকটের মুহূর্তে তাঁর হাতে এসে পড়ল ঈশোপনিষদের একটি ছিন্নপত্র; যাতে লেখা ছিল—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।।

এর মানে কী? তিনি ছুটলেন সংস্কৃত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। বিদ্যাবাগীশ বললেন— 'সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের দ্বারা মণ্ডিত। কাজেই সমস্তকিছু ত্যাগ করে এক অপার অনন্ত ঐশ্বরীয় আনন্দ উপভোগ করো।' তিনি যার সন্ধান করছিলেন, তাই হাতে পেলেন। শুরু হলো রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে নিয়মিত উপনিষদ অধ্যয়ন। ধীরে ধীরে উপনিষদের উপর কিছু অধিকার জন্মালো। সমধর্মী বন্ধুদের নিয়ে উপনিষদের আলোচনার জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন তত্ত্ববোধিনী সভা। ক্রমে ক্রমে শুরু হলো তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। এই পাঠশালা হয়তো শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পূর্বরূপ। তারপর ব্রাহ্মসমাজে যোগদান। অবশেষে ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ২০ জন সঙ্গী নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মন দিলেন।

এই সময় একদিকে খ্রিস্টান পাদরিগণ প্রথা সংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সমাজকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে চলেছে। অন্যদিকে দেশীয় সমাজপতি পণ্ডিতগণ প্রথা ও সংস্কারকে অভ্রান্ত বলে মনে করে— আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরছেন। এই দ্বিমুখী আক্রমণে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ছে। এইসব আঘাত থেকে হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সচেষ্ট হলেন। সনাতন ঔপনিষদিক হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা এবং পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি শুরু করলেন। তখন স্কটল্যান্ডের মিশনারি ডফ সাহেব কলকাতায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অক্লান্ত প্রচার করছিলেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে আনতেন। এবং হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে নানারকম কুৎসা রটনা করতেন। এইসময় ডফ সাহেব এককানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম 'Indian and India's Missions'। এই গ্রন্থে ডফ হিন্দুধর্ম এবং বেদান্তের যথেষ্ট নিন্দা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ডফের বইয়ের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এইসময় অন্যান্য মিশনারি পত্রিকায় হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো সেগুলিকেও সমুচিত জবাব দিতে লাগলেন। পরে মহর্ষির এই প্রতিবাদ প্রবন্ধগুলি একত্র সংকলিত হয়ে 'Vedantic Doctrines Vendicated' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এরপর খ্রিস্টধর্মের কুসংস্কার কুপ্রথা ইত্যাদিকে সমালোচনা করে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন 'Rational Analysis of the Gospel' নামে একখানি গ্রন্থ। এই বই দু'খানি প্রকাশিত হবার ফলে দেশের শিক্ষিত লোকে মিশনারিদের স্বরূপ বুঝতে পারল। খ্রিস্টধর্মের অযৌক্তিকতা এবং বেদান্তধর্মের সারবত্তা অনুধাবন করল।

এইসব বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটল। ডফ সাহেব, অভিভাবকগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁর বিদ্যালয়ের চৌদ্দ বছর বয়স্ক ছাত্র উমেশচন্দ্র সরকার ও তার এগারো বছর বয়স্কা বালিকা পত্নীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। এই উমেশচন্দ্র ছিলেন 'কার ঠাকুর কোম্পানি'র কর্মী রাজেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র। এই সংবাদ শুনে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হন। তিনি গর্জন করে বললেন, 'অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খ্রিস্টান করিতেছে? তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।'

শুধু বাদ-প্রতিবাদ নয়, তিনি লক্ষ্য করলেন 'পাদ্রিরা আপনাদিগের ধর্ম প্রচার জন্য নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে। আর আমাদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত একটিও উত্তম পাঠশালা নাই।' তাঁর এই প্রয়াসেরই পরিণতি 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' এইসময় প্রতিদিন দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রমুখ ব্যক্তিদের অবিলম্বে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি করে বিদ্যালয় স্থাপনের অনুরোধ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের এইসব প্রচেষ্টায় আর মিশনারিদের ভ্রান্তি এবং দুর্ব্যবহারে সকলের মন উত্তেজিত হলো। এই মহা আন্দোলনে নিদ্রিতপ্রায় হিন্দু সমাজ জেগে উঠল। খ্রিস্টধর্মের প্রচারবেগ মন্দীভূত হলো। ডফ সাহেব নিরাশ অন্তঃকরণে এ দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

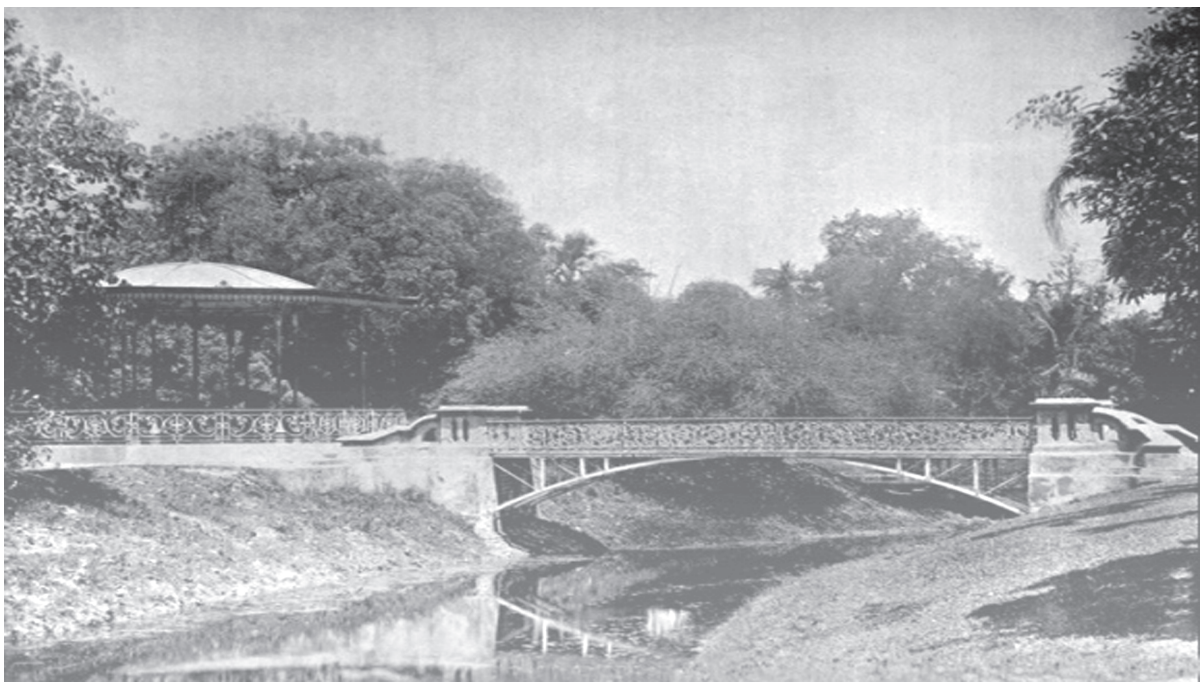

বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির একাংশ।

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মসংস্কার এবং হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার কাজে যত মনোযোগী হলেন, বৈষয়িক ব্যাপারে ঔদাসীন্য ততই বেড়ে চলল। পিতা দ্বারকানাথ তখন বিদেশে। বিষয়কর্মের প্রতি পুত্রের কোনো মনোযোগ নেই— এই অভিযোগ তাঁর কাছে অবশ্যই পৌঁছেছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ পুত্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে একটি চিঠিতে লিখেলেন— 'আমার সকল বিষয়সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই, ইহাই আমার আশ্চর্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয়পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখো। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার শক্তি আমার নাই, যদি থাকিত আমি অবিলম্বে লন্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।'

দেবেন্দ্রনাথ মর্মাহত হলেন। ভয়ঙ্কর এক অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিমর্ষ চিত্ত। কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছেন না। স্থির থাকতে পারছেন না। অস্থির মনে ভরা বর্ষার ভয়ঙ্কর পদ্মানদীতে সপরিবারে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা-তুফান, মাঝি ভয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিল। মহর্ষি অবিচল। ঈশ্বরের উপাসনা করে চলেছেন। বোধহয় করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেদিন তিনি রক্ষা পেলেন। এই ঝড় কি কোনো বিপদের পূর্বাভাস? হৃদয়ে আতঙ্ক নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। অকস্মাৎ বজ্রপাত। খবর পেলেন বিলেতে পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়েছে।

পিতার মৃত্যুর দেড় বছরের মধ্যে তাঁদের ব্যবসা ও ব্যাঙ্কের পতন হলো। তখন তাঁদের হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা। আর পাওনা সত্তর লক্ষ টাকা। অর্থাৎ তিরিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান।

দ্বারকানাথ ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এমন বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন যে, পিতৃঋণ পরিশোধ না করলে, পাওনাদাররা দেবেন্দ্রনাথের উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারত না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ গাড়ি, ঘোড়া, দামি দামি আসবাবপত্র নিলামে বিক্রি করে পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করলেন। শুরু হলো অনাড়ম্বর জীবনযাপন। পিতা দ্বারকানাথের একদিনের ডিনারে খরচ হতো ৩০০ টাকা। এখনকার দিনে যার মূল্য ৬০ হাজার টাকা। আর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের ডিনারের খরচ দাঁড়ালো চার আনা। এখনকার দিনে প্রায় ৫০ টাকা। এইসময় দেবেন্দ্রনাথ শুধু ডাল আর রুটি খেয়ে থাকতেন। তবে ঠাকুরবাড়িতে এই কৃচ্ছ্রসাধন চলেছিল মাত্র ছয় মাস। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ব্যবসা বাণিজ্য থেকে সরে এসে শুধু জমিদারি দেখাশোনা করে পারিবারিক সম্মান ও আভিজাত্য বজায় রেখেছিলেন। শোনা যায়, এই সময় শোভাবাজারের রাজবাড়িতে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে শহরের বিত্তবানরা এসেছেন বহুমূল্য রত্নসম্ভারে সজ্জিত হয়ে। এককালের বিত্তবান দেবেন্দ্রনাথ কীভাবে উপস্থিত হবেন— এই নিয়ে সকলের কৌতূহল। জুড়িগাড়ি এসে থামল। সাদাসিধা পরিচ্ছদ শুভ্র ধুতি চাদর। পায়ে একজোড়া সাদা নাগরা জুতো। তার উপর বহুমূল্য মুক্তো বসানো। অন্যেরা যেসব মণিমুক্তা গলায়, মাথায় ধারণ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাকে পায়ে স্থান দিয়েছেন। এরপর শুরু হলো পরিব্রাজকের জীবন। সঙ্গে নিলেন কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে। সুউচ্চ হিমালয় শৃঙ্গে অনেক রাত্রে গায়ে একখানি লাল চাদর জড়িয়ে হাতে মোমবাতি নিয়ে নিঃশব্দে তিনি এগিয়ে চলেছেন উপাসনা করতে। পুত্রকে পাশে দাঁড় করিয়ে সূর্যোদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্তে উপনিষদ পাঠ করছেন। এইভাবেই পুত্র রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বীণায় উপনিষদের সুরটি বেঁধে দিয়েছিলেন মহর্ষি।

মহর্ষির অনবদ্য গদ্যরচনা আধ্যাত্মিক তথা সাহিত্যের সম্পদবিশেষ। মহর্ষির 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন প্রতিফলিত। পার্বত্য নদী দেখতে দেখতে তিনি লিখেছেন— 'এখানে নদী কেমন নির্মল ও শুভ্র। ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেই দিকে প্রবল বেগে ছুটিতেছে?' বস্তুত পার্বত্য নদী সমতলে এলে পশু-পাখী-মানুষের উপকারে লাগবে। সমাজের মঙ্গল হবে। নদীর জল লোকে পান করবে। ফসল ফলবে। নদীর চূড়ান্ত লক্ষ্য সাগরসঙ্গমে মিলিত হওয়া। মানুষের উপকার করতে করতেই একদিন নদী সমুদ্রে উপনীত হবে। তেমনি সমাজ সংসার ছেড়ে নির্জনে পর্বতে সাধনা নয়। ঈশ্বর যেন মহর্ষিকেও আদেশ দিলেন সংসারে প্রত্যাবর্তন করে সমাজ সংসার তথা মানুষের উপকার করার জন্য। এই জীবনদর্শনই কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তি স্বাদ।

'আত্মজীবনী'তে মহর্ষি যখন লেখেন ঃ 'এই ক্ষণভঙ্গুর দুঃখময় সংসারে কাহার ভাগ্যে কখন কী ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে?' তখন তা হয়ে ওঠে ভগবদগীতার ভাষ্যরূপ। গীতায় বলা হয়েছে—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বিতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।

দুঃখের দিনে যিনি উদ্বিগ্ন হন না, আবার সুখের দিনে যিনি আত্মহারা হন না। যাঁর রাগ, ভয়, ক্রোধ কিছুই নেই, তিনিই স্থিতধী, তিনিই মহর্ষি। তাঁর জীবন ঈশ্বরময়, আনন্দময়। মহর্ষির এই জীবনদর্শন আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হোক। আমাদের জীবন ঈশ্বরময় আনন্দময় হয়ে উঠুক। ▮